ইউনিট ৯

আব্বাসীয় খিলাফত [৭৫০ খ্রি. হতে ১২৫৮ খ্রি. পর্যন্ত]

ভূমিকা

ইসলামের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে আব্বাসীয় বংশের শাসন। ইসলামের গৌরবদীপ্ত অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল এ সময়। উমাইয়া খিলাফতের পতনের পর ৭৫০ খ্রি. আব্বাসীয় রাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। আব্বাসীয়দের সুদীর্ঘ পাঁচশ বছরের রাজত্বকাল মুসলিম শাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাজ্য বিস্তারের পরিবর্তে মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপিত হয়। উমাইয়া যুগ ছিল আরবদের একক আধিপত্যের যুগ। আব্বাসীয় যুগে উমাইয়াদের সংকীর্ণ রাষ্ট্রনীতির পরিবর্তন করে উদার নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেয়। আব্বাসীয়রা আরব-অনারব সকল শ্রেণীর মুসলমানদের সমান অধিকার দান করেন। তাই আব্বাসীয় খিলাফত ছিল সর্বজনীন। আব্বাসীয় রাজবংশে মোট ৩৭ জন খলিফা শাসন পরিচালনা করেছেন। তাঁরা ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ হতে ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

উমাইয়া যুগে মুসলমানরা বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে সাম্রাজ্য পরিচালনা করত। এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ এ তিনটি মহাদেশের উপর মুসলমানদের কর্তৃত্ব ছিল। আব্বাসীয়রা ক্ষমতায় এলে বিশাল সাম্রাজ্য তিনটি অংশে ভাগ হয়ে যায়। স্পেন উমাইয়াদের শাসনে থেকে এবং উত্তর আফ্রিকায় স্বাধীন সার্বভৌম ফাতেমীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এককেন্দ্রিক সাম্রাজ্যের পরিবর্তে তিনটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজ্যের উদ্ভব হয়। উমাইয়াদের রাজত্বে আরবের প্রাধান্য এবং হিংসার রাজনীতি বেশি চলত। কিন্তু আব্বাসীয়রা ভ্রাতৃত্ব, সাম্য ও পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিয়ে উদার নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে রাজত্ব পরিচালনা করে। ফলে তাঁদের রাজত্বকাল দীর্ঘায়িত হয়। এ সময় একক আরবীয় জাতীয়তাবাদের পতন এবং বিশ্বজনীন মুসলিম জাতীয়তাবাদের ঔন্মেষ ঘটে।

আব্বাসীয় আমলে রাজনীতিতেও গুণগত পরিবর্তন আসে। উজির বা মন্ত্রীর পদ সৃষ্টি হয়। দামেস্কের পরিবর্তে বাগদাদ রাজধানী ও কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়। আব্বাসীয়দের রাজ্য বিস্তার নীতি না থাকায় সামরিক শক্তি হ্রাস পায়। এতে সাম্রাজ্য সংকুচিত হতে থাকে। আব্বাসীয় খলিফাগণ রাজ্য বিজয়ের চেয়ে আধ্যাত্মিক ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষের প্রতি বেশি নজর দেন। আব্বাসীয় আমলে সকল শ্রেণীর মুসলমানগণ খিলাফতের শাসন কার্যে কর্তৃত্ব করার সুযোগ পায়। মাওয়ালিগণ মুক্তি লাভ করে এবং তারা আরবদের সাথে সমান অধিকার পেয়ে ক্ষমতায় অংশগ্রহণ করে।

আব্বাসীয় যুগে শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। প্রকৃত পক্ষে আব্বাসীয় যুগ ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগ। আব্বাসীয়রা ৫০৮ বছর পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁদের প্রথম খলিফা ছিলেন আবুল আব্বাস আস্-সাফফাহ। আব্বাসীয় বংশের খলিফাদের মধ্যে আল-মনসুর, হারুন-অর-রশীদ এবং আল মামুন ছিলেন প্রখ্যাত। তাঁদের আমলকে ইতিহাসের সোনালী যুগ বলা হয়। এঁরা ছিলেন অসাধারণ জ্ঞান পিয়াসী। তাঁদের উদার ও অপরিসীম দানে মুসলিম সভ্যতা পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। তাঁদের পর হতে আব্বাসীয়দের পতনের যুগ শুরু হয়। খলিফা মুসতাসিম বিল্লাহর নিহত ও বাগদাদের পতনের মাধ্যম আব্বাসীয় খিলাফতের পরিসমাপ্তি ঘটে।

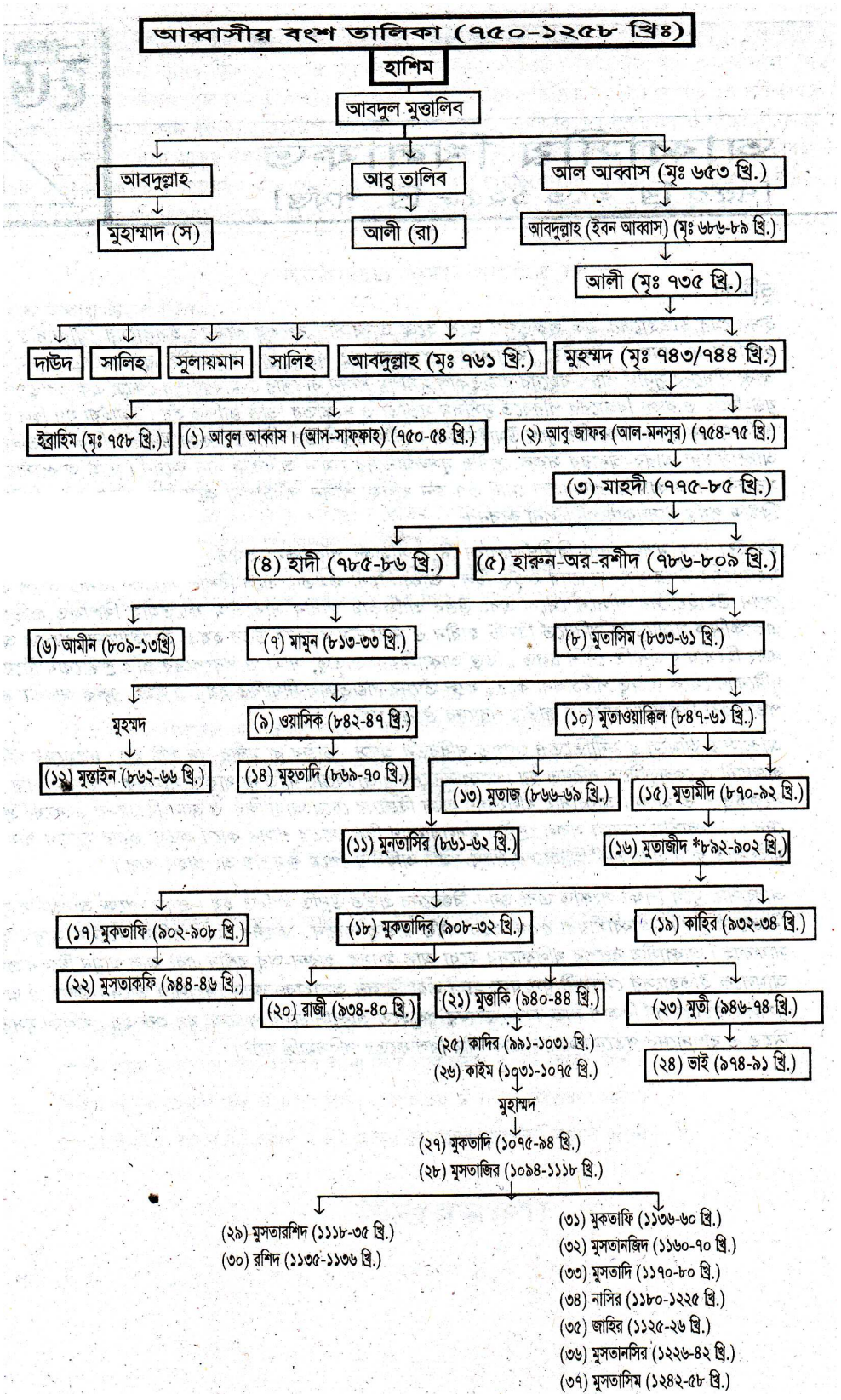
আব্বাসীয় বংশ তালিকা (৭৫০-১২৫৮ খ্রিঃ)
হাশিম
আবদুল মুত্তালিব
আবদুল্লাহ
আবু তালিব
আল আব্বাস (মৃঃ ৬৫৩ খ্রি.)
মুহাম্মাদ (স)
আলী (রা)
আবদুল্লাহ (ইবন আব্বাস) (মৃঃ ৬৮৬-৮৯ খ্রি.)
আলী (মৃঃ ৭৩৫ খ্রি.)
দাউদ
সালিহ
সুলায়মান
সালিহ
আবদুল্লাহ (মৃঃ ৭৬১ খ্রি.)
মুহম্মদ (মৃঃ ৭৪৩/৭৪৪ খ্রি.)
ইব্রাহিম (মৃঃ ৭৫৮ খ্রি.)
(১) আবুল আব্বাস। (আস-সাফ্ফাহ) (৭৫০-৫৪ খ্রি.)
(২) আবু জাফর (আল-মনসুর) (৭৫৪-৭৫ খ্রি.)
(৩) মাহদী (৭৭৫-৮৫ খ্রি.)
(৪) হাদী (৭৮৫-৮৬ খ্রি.)
(৫) হারুন-অর-রশীদ (৭৮৬-৮০৯ খ্রি.)
(৬) আমীন (৮০৯-১৩খ্রি)
(৭) মামুন (৮১৩-৩৩ খ্রি.)
(৮) মুতাসিম (৮৩৩-৬১ খ্রি.)
মুহম্মদ
(৯) ওয়াসিক (৮৪২-৪৭ খ্রি.)
(১০) মুতাওয়াক্কিল (৮৪৭-৬১ খ্রি.)
(১২) মুস্তাইন (৮৬২-৬৬ খ্রি.)
(১৪) মুহতাদি (৮৬৯-৭০ খ্রি.)
(১৩) মুতাজ (৮৬৬-৬৯ খ্রি.)
(১৫) মুতামীদ (৮৭০-৯২ খ্রি.)
(১১) মুনতাসির (৮৬১-৬২ খ্রি.)
(১৬) মুতাজীদ *৮৯২-৯০২ খ্রি.)
(১৭) মুকতাফি (৯০২-৯০৮ খ্রি.)
(১৮) মুকতাদির (৯০৮-৩২ খ্রি.)
(১৯) কাহির (৯৩২-৩৪ খ্রি.)
(২২) মুসতাকফি (৯৪৪-৪৬ খ্রি.)
(২০) রাজী (৯৩৪-৪০ খ্রি.)
(২১) মুত্তাকি (৯৪০-৪৪ খ্রি.)
(২৩) মুতী (৯৪৬-৭৪ খ্রি.)
(২৫) কাদির (৯৯১-১০৩১ খ্রি.)
(২৬) কাইম (১০৩১-১০৭৫ খ্রি.)
(২৪) ভাই (৯৭৪-৯১ খ্রি.)
মুহাম্মদ
(২৭) মুকতাদি (১০৭৫-৯৪ খ্রি.)
(২৮) মুসতাজির (১০৯৪-১১১৮ খ্রি.)
(২৯) মুসতারশিদ (১১১৮-৩৫ খ্রি.)
(৩০) রশিদ (১১৩৫-১১৩৬ খ্রি.)
(৩১) মুকতাফি (১১৩৬-৬০ খ্রি.)
(৩২) মুসতানজিদ (১১৬০-৭০ খ্রি.)
(৩৩) মুসতাদি (১১৭০-৮০ খ্রি.)
(৩৪) নাসির (১১৮০-১২২৫ খ্রি.)
(৩৫) জাহির (১২২৫-২৬ খ্রি.)
(৩৬) মুসতানসির (১২২৬-৪২ খ্রি.)
(৩৭) মুসতাসিম (১২৪২-৫৮ খ্রি.)

আব্বাসীয়দের পরিচয় ও আন্দোলন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- আব্বাসীয় কারা তা বলতে পারবেন
- আব্বাসীয় আন্দোলনের পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন
- আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে পারবেন
- আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠার ঘটনা পরম্পরার বিবরণ দিতে পারবেন।

আব্বাসীয়দের পরিচয়

হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর চাচা ছিলেন আল-আব্বাস (রা)। তিনি ছিলেন আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র। আল-আব্বাসের নামানুসারে আব্বাসীয় রাজবংশের নামকরণ করা হয়েছে। আব্বাসীয়গণ কুরাইশ বংশের হাশিমী শাখা থেকে উদ্ভূত। উমাইয়ারাও কুরাইশ বংশের। তবে রাসূলুল্লাহর (স) নিকটতম ছিলেন আব্বাসীয়রা। এজন্য তাঁরা নিজেদেরকে খিলাফতের সত্যিকার দাবিদার বলে মনে করেন। তাঁরা আরও মনে করতেন উমাইয়াগণ তাঁদের থেকে জোর করে খিলাফত ছিনিয়ে নিয়েছে। তাঁদের এই ন্যায্য দাবি বাস্তবায়নের জন্য তাঁরা উমাইয়াদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেন।

হযরত আব্বাস ৩২ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। তাঁর চার পুত্র আব্দুল্লাহ, ফযল, উবায়দুল্লা এবং কাইসান। বড় ছেলে আব্দুল্লাহ ইতিহাসে ইবনে আব্বাস নামে পরিচিত। হযরত আব্বাসের চার পুত্রই যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন। তাঁরা হযরত আলীর (রা) সমর্থনে সিফ্ফিনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা হযরত আলী (রা) ও তাঁর পুত্রদের সমর্থক ও সহযোগী ছিলেন। কারবালার মর্মান্তিক ঘটনায় ইবনে আব্বাস খুবই শোকাহত হন। তিনি ৭০ বছর বয়সে ভাঙা মন নিয়ে তায়েফে মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র আলী পরিবারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ৭৩৫ খ্রিস্টাব্দে আলীর মৃত্যু হলে পুত্র মুহাম্মদ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। মুহাম্মদ খুবই উচ্চাভিলাষী ছিলেন। তিনি মনে মনে খিলাফত দখলের বাসনা পোষণ করতেন। তিনিই ছিলেন আব্বাসীয় আন্দোলনের প্রধান এবং প্রথম উদ্যোক্তা।

মুহাম্মাদ আব্বাসীয় আন্দোলনের প্রধান ও প্রথম উদ্যোক্তা

মুহাম্মদের আন্দোলনের দুটো দিক ছিল খিলাফতে তাঁর বংশের দাবির ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে। এর সপক্ষে তিনি বংশানুক্রমিক সূত্রের কথা সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরেন। কারবালায় ইমাম হুসাইনের শাহাদাতের পর ইসলামের ইমামত (নেতৃত্ব) ফাতেমীয়দের জন্য শেষ হয়ে যায়। কেননা হযরত ফাতেমার বংশের একমাত্র জীবিত পুরুষ ছিলেন ইমাম হুসাইনের ৬ বছরের ছেলে যয়নুল আবেদীন। তিনি নাবালক হওয়ায় তাঁর উপর ইমামত অর্পণ করা যায় না। সুতরাং ইমাম হুসাইনের শাহাদাতের পর যয়নুল আবেদীনের সৎ মায়ের ছেলে মুহাম্মদ আল-হানাফিয়ার উপর ইমামত অর্পিত হয়।

হযরত আলী (রা) হযরত ফাতেমা (রা)-এর মৃত্যুর পর হানাফিয়া গোত্রের এক মহিলাকে বিয়ে করেন, সে ঘরের সন্ত ান হলেন এই মুহাম্মদ আল-হানাফিয়া। মুহাম্মদ আল হানাফিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হাশিম নেতৃত্ব দেন। হাশিম মৃত্যুর পূর্বে তাঁর নেতৃত্ব মুহাম্মাদ বিন আলী বিন আব্দুল্লাহকে দিয়ে যান। মুহাম্মদ বিন আলী মারা যাবার আগে তাঁর তিন পুত্র ইবরাহীম, আব্বাস আস সাফফাহ এবং আবু জাফরকে পর্যায়ক্রমে খিলাফতের জন্য মনোনীত করে যান। এভাবে আব্বাসীয়রা খিলাফতের দাবিদার হন এবং তা পুনরুদ্ধারের জন্য আন্দোলন করতে থাকেন।

হযরত মুহাম্মাদের (স) নিকটতর আত্মীয়তার দাবি

উমাইয়া ও আব্বাসীয়রা কুরাইশ বংশের হলেও উমাইয়াদের চেয়ে আব্বাসীয়রা হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নিকটতর ছিলেন। হযরত মুহাম্মদের (স) চাচা আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের নামেই এ বংশের নামকরণ করা হয়েছে। অপরদিকে উমাইয়াগণ আবদুশ শামসের বংশধর। কাজেই আব্বাসীয়গণ নবীর (স) বেশি নিকটের ছিল।

মুহাম্মাদ বিন আলী নিজ দাবির সপক্ষে এ সকল যুক্তি দিয়ে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে থাকে। সাধারণ মানুষের ব্যাপক সমর্থন তাঁর দিকে চলে আসে। তাছাড়া মুয়াবিয়ার কূটকৌশল, ইয়াযিদের অযোগ্যতা এবং কারবালার মর্মান্তিক ঘটনায় মুসলমানগণ উমাইয়াদের বিপক্ষে চলে যায়। এভাবেই উমাইয়া বিরোধী আব্বাসীয় আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে।

আব্বাসীয় আন্দোলনের পটভূমি

০ উমাইয়াদের স্বৈরশাসন ঃ ক্ষমতাসীন উমাইয়া শাসকরা স্বৈরনীতি অবলম্বন করে। তাঁরা একের পর এক যুলুম-নির্যাতন করতে থাকে। রাসূল (স) ও আলী (রা) বংশীয় লোকদের বিরুদ্ধে হত্যা-সন্ত্রাস চালাতে থাকে। তাঁরা কারবালার প্রান্তরে রাসূল (স)-এর দৌহিত্র ইমাম হুসাইনসহ তাঁর পরিবার ও সঙ্গী-সাথীদের উপর লোমহর্ষক ও হৃদয়বিদারক হত্যাযজ্ঞ চালায়। বহু নিরপরাধ সাহাবী, তাবিয়ী ও সত্যপন্থীদেরকে হত্যা করা হয়। মোটকথা বিশ্ব ইতিহাসের একটা বর্বরতম স্বৈরশাসনের অধ্যায় রচনা করে তাঁরা। তাঁদের এহেন যুলুমের বিরুদ্ধে জনমনে প্রতিশোধের আগুন ধূমায়িত হতে থাকে।

০ উমাইয়া বিরোধী আন্দোলন ঃ উমাইয়া শাসকদের স্বৈরতন্ত্র ও কূটকৌশলের বিরুদ্ধে জনমত ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। সমগ্র সাম্রাজ্যব্যাপী ঘন ঘন বিদ্রোহ দেখা দিতে থাকে। এই ধূমায়িত অসন্তোষ ধীরে ধীরে বিস্ফোরিত হতে থাকে। জোরদার হতে থাকে উমাইয়া বিরোধী আন্দোলন। দ্বিতীয় মারওয়ানের সময় এ আন্দোলন চূড়ান্ত রূপলাভ করে।

০ আব্বাসীয় আন্দোলনের জনপ্রিয়তা লাভ ঃ উমাইয়াদের কার্যকলাপে জনগণ ছিল বিক্ষুব্ধ। এমন সময় সূত্রপাত হয় আব্বাসীয় আন্দোলনের। হযরত মুহাম্মদ (স)-এর চাচা হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহর পুত্র আলী এই আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর পুত্র মুহাম্মাদ এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

আব্বাসীয় নেতৃবৃন্দ মুসলমানদেরকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলেন যে, তাঁরা রাসূল (সা)-এর বংশের লোক, তাঁরা কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী কাজ করবেন, তাঁদের হাতে আল্লাহর বিধি বিধান কায়েম হবে। আব্বাসীয় নেতা আবুল আব্বাস আস সাফফাহ বনী উমাইয়াদের অত্যাচার অবিচারের বিষয় উল্লেখ করে বলেছিলেন, "আমি আশা করি, যে খান্দান থেকে তোমরা কল্যাণ লাভ করেছ, সে খান্দান হতে তোমাদের উপর কোন যুলুম-নির্যাতন চালান হবে না। যে খান্দান হতে তোমরা সংশোধনের পথ লাভ করেছ, সে খান্দান তোমাদের ওপর কোন ধ্বংস বা বিপর্যয় ডেকে আনবে না।"

এভাবে আব্বাসীয় আন্দোলন ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। উমাইয়াদের বিরুদ্ধে পুঞ্জিভূত ক্ষোভ নিয়ে দলে দলে লোক আব্বাসীয় আন্দোলনে যোগ দিতে থাকে। এভাবে আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হতে থাকে।

আব্বাসীয়দের খিলাফত

০ মুহাম্মাদের নেতৃত্বে আন্দোলন ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস মৃত্যুবরণ করার পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর পৌত্র মুহাম্মাদ পরিবারের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। মুহাম্মদ আব্বাসীয়গণের জন্য খিলাফত দখলের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি খিলাফত তাঁর এবং তাঁর বংশের দাবির ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রমাণের জন্য সর্বসাধারণের নিকট প্রচারকার্য চালিয়ে যেতে থাকেন।

আব্বাসীয়গণ কুরাইশ বংশের হাশেমী শাখা হতে উদ্ভূত। সুতরাং তাঁরা উমাইয়াদের চেয়ে মুহাম্মদ (স)-এর নিকটতম, এই দাবি জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে। তাঁরা রাসূল (স) ও আলী (রা) পরিবারের স্বার্থ রক্ষার সংগ্রাম করছেন, মনে করে জনসাধারণ বিশেষত ইরানী শিয়ারা এই আন্দোলনকে অকুণ্ঠভাবে সমর্থন করেন। উমাইয়াদের অনৈসলামী ও স্বৈরনীতিতে ক্ষুব্ধ সুন্নী মুসলমানরাও এই আন্দোলনের সমর্থক হতে থাকে।

০ কারবালার হত্যাকাণ্ড ও জোরদার আন্দোলন ঃ ইতোমধ্যে কারবালা প্রান্তরে সংঘটিত হয় ইতিহাসের বর্বরতম হত্যাকাণ্ড। মুয়াবিয়া (রা)-এর পুত্র চরিত্রহীন উমাইয়া খলিফা ইয়াযিদের ইঙ্গিতে রাসূল (স)-এর দৌহিত্র ইমাম হুসাইন (রা) সপরিবারে নিহত হন। ইমাম হুসাইনের রক্ত মুসলিম বিশ্বে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। এমনি প্রেক্ষাপটে আব্বাসীয়রা তাঁদের আন্দোলন শুরু করে। ক্রমে এ আন্দোলন মজবুত ভিত্তি লাভ করে। খলিফা হিশামের মৃত্যুর পর এই আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় মারওয়ানের আমলে তা প্রবল আকার ধারণ করে। এ সময় মুহাম্মদ-এর মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র ইবরাহীম আব্বাসীয়দের নেতা নিযুক্ত হন। সৌভাগ্য ক্রমে তিনি তার প্রচার কার্যের জন্য অসাধারণ যোগ্যতা সম্পন্ন আবু মুসলিম খোরসানীকে পান।

আবু মুসলিম-এর প্রচারণা ঃ আব্বাসীয় আন্দোলনে প্রবল গতি সৃষ্টি করেন আবু মুসলিম খোরাসানী। তিনি ইবরাহীমের সহযোগী হিসেবে আবির্ভূত হন। তাঁর ছিল অসাধারণ বাগ্মীতা-বাকচাতুর্য। তার বক্তৃতায় সর্বস্তরের লোক এমনকি শত্রুও তাঁর সহযোগী হয়ে যেত। তাঁর প্রচারণায় হিমারীয়, মুদারীয় নির্বিশেষে সর্বস্তরের লোক আব্বাসীয় আন্দোলনে শরীক হতে থাকে।

খোরাসান দখল ঃ আবু মুসলিমের প্রচারণায় আলাভী, ফাতেমী, সুন্নী, মাওয়ালী, খারিজী, শিয়া প্রভৃতি দল ও মতের লোক তাদের সকল মতপার্থক্য ভুলে আবু মুসলিমের পতাকা তলে সমবেত হতে থাকল। এভাবে খোরাসান আব্বাসীয়দের শক্তিশালী ঘাঁটিতে পরিণত হল। উমাইয়া খলিফা মারওয়ান যখন সিরিয়ায় এবং খোরাসানের উমাইয়া শাসনকর্তা নাসর ইবনে সাইয়ার যখন কিরমানের খারিজী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, তখন আবু মুসলিম এ সুযোগে খোরাসানে আব্বাসীয়গণের কালো পতাকা উত্তোলন করেন। তিনি রাজধানী মার্ভ দখল করেন। নাসর আবু মুসলিমের সেনাপতি কাহাতাবা কর্তৃক পরাজিত হয়ে মারওয়ানের নিকট সাহায্য চেয়ে পাঠান। সাহায্য এসে পৌঁছবার আগেই খোরাসান ও পরগণা আবু মুসলিমের হস্তগত হয়। পলায়নপর নাসর নিহত হন।

০ ইরাক অধিকার ঃ খোরাসানের পতনের পর মারওয়ান বিচলিত হয়ে আব্বাসীয় আন্দোলনের মূল নেতা ইবরাহীমকে বন্দী করেন। কিন্তু আবু মুসলিম সেদিকে কর্ণপাত না করে অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখেন। ইতোমধ্যে তার সেনাপতি কাহাতাবা ও খালিদ বিন বার্মাক ইউফ্রেটিস নদী পার হয়ে ঐতিহাসিক কারবালা প্রান্তরে হাজির হন। এখানে ইরাকের উমাইয়া শাসক ইয়াযিদের সাথে তাদের এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ইয়াযিদ পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। ফলে ইরাকের রাজধানী কুফাও আবু মুসলিমের অধিকারে আসে।

০ নিহাওয়ান্দ ও মেসোপটেমিয়া অধিকার ঃ এ দিকে আবু মুসলিমের অপর সেনাপতি আবু আয়াস মারওয়ানের পুত্র আব্দুল্লাহকে পরাজিত করে পারস্যের নিহাওয়ান্দ ও মেসোপটেমিয়া দখল করেন। এ সকল দুঃসংবাদ শুনে খলিফা মারওয়ান রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন এবং আব্বাসীয় নেতা ইবরাহীমকে হত্যা করেন। মৃত্যুর পূর্বে ইবরাহীম তাঁর ভাই আবুল আব্বাসকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে ইচ্ছাপত্র রেখে যান।

০ আবুল আব্বাসের খিলাফতে আরোহন ঃ ভ্রাতা ইবরাহীম নিহত হবার পর আবুল আব্বাস কালো পোশাকে নিজেকে আচ্ছাদিত করে গোপনে কুফায় প্রবেশ করেন। ৭৪৯ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে (১৩২ হিজরির রবিউস সানী) কুফার মসজিদে আবুল আব্বাস ইরাকবাসীগণ কর্তৃক মুসলিম জাহানের খলিফা বলে ঘোষিত হন। সমবেত ইরাকবাসী তাঁর প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে। বাইয়াত গ্রহণের পর উদ্বোধনী ভাষণে তিনি যুলুম-নির্যাতনের অবসান এবং উমাইয়াদের নৃশংসতার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের শপথ গ্রহণ করেন। তিনি 'আস-সাফফাহ' বা রক্ত পিপাসু উপাধি গ্রহণ করেন।

০ জাব-এর যুদ্ধ ও আব্বাসীয়দের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা লাভ ঃ উমাইয়া খলিফা মারওয়ান খিলাফত পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হলেন। একলাখ বিশ হাজার সৈন্যসহ তিনি টাইগ্রিস নদী অতিক্রম করে বড় জাব নদীর দিকে অগ্রসর হলেন। ইতোমধ্যে আবু আয়ুন আবুল আব্বাসের পাঠানো সৈন্য সাহায্যপ্রাপ্ত হলেন। এই সম্মিলিত বাহিনীর সেনাপতির দায়িত্বপ্রাপ্ত হন আবুল আব্বাসের জনৈক পিতৃব্য আব্দুল্লাহ।

৭৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি বড় জাব নদীর পূর্ব তীরে কুসাফ নামক গ্রামে উভয় বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ভয়াবহ এ যুদ্ধে মারওয়ান শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করেন। মারওয়ানের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে উমাইয়া খিলাফতের চির অবসান ঘটে। নিরঙ্কুশভাবে ক্ষমতা দখল করেন আব্বাসীয়রা। সমগ্র উমাইয়া সাম্রাজ্য আব্বাসীয়দের হস্তগত হয়।

এভাবে রাসূল (স), আলী-ফাতিমার বংশধরদের জনপ্রিয়তার পথ ধরে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন আব্বাসীয়রা। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠায় আবু মুসলিম খোরাসানির অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর মতো অসাধারণ প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোকের নেতৃত্ব না পেলে আব্বাসীয়গণ এমন সাফল্য লাভে সমর্থ হতো না।

সার-সংক্ষেপ

আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র আল-আব্বাস (রা) মহানবীর (স) চাচা ছিলেন। তাঁর নামানুসারে আব্বাসীয় বংশের নামকরণ। আব্বাসীয়রা নিজেদেরকে বিভিন্ন যুক্তিতে খিলাফতের দাবিদার বলে মনে করত। তাছাড়া, উমাইয়াদের আব্বাসীয়দের প্রতি অত্যাচার ও নির্যাতন বিশেষ করে কারবালার প্রান্তরে ইমাম হুসাইনের শাহাদাতকে কেন্দ্র করে আরও মর্মান্তিক পরিবেশের সৃষ্টি করে। সাধারণ মানুষ উমাইয়াদের শাসননীতিতে বীত শ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে আব্বাসীয়রা ক্ষমতা পাওয়ার জন্য আন্দোলন শুরু করেন। এক সময় উমাইয়াদের পতন ঘটিয়ে তাঁরা ক্ষমতায় চলে আসেন। তাঁদের বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৯.১

শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. হযরত মুহাম্মাদ (স) এর ..... ছিলেন আল-আব্বাস (রা)।

২. তিনি ছিলেন .... পুত্র।

৩. ..... নামানুসারে আব্বাসীয় রাজবংশের নামকরণ করা হয়।

৪. আব্বাসীয়গণ কুরাইশ বংশের ..... থেকে উদ্ভূত।

৫. উমাইয়ারাও ..... বংশের।

৬. তবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকটতম ছিলেন ..... ।

৭. এজন্য তাঁরা নিজেদের ..... সত্যিকার দাবিদার বলে মনে করেন।

৮. তারা আরও মনে করতেন যে, উমাইয়া তাঁদের থেকে ..... করে খিলাফত ছিনিয়ে নিয়েছে।

৯. তাঁদের এই দাবি বাস্তবায়নের জন্য তাঁরা ..... বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে চেষ্টা করেন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. আব্বাসীয়দের পরিচয় দিন।
২. আব্বাসীয় আন্দোলনের প্রধান ও প্রথম উদ্যোক্তা কে ছিলেন?
৩. আব্বাসীয় আন্দোলনের পটভূমি সম্পর্কে লিখুন।
৪. আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।
৫. আবু মুসলিমকে ছিলেন? তাঁর সম্বন্ধে টীকা লিখুন।

পাঠ ২ আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠায় আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ (৭৫০-৭৫৪ খ্রি.)-এর ভূমিকা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- আবুল আব্বাস আস্‌সাফফাহর পরিচয় বলতে পারবেন
- আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠায় আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ-এর ভূমিকার বিবরণ দিতে পারবেন
- আবুল আব্বাসের চরিত্র ও কৃতিত্বের বিবরণ দিতে পারবেন।

আব্বাসীয় প্রথম খলিফার পরিচয়

আব্বাসীয় খিলাফতের প্রথম খলিফার নাম আবুল আব্বাস। তাঁর পিতার নাম মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব। রাসূল (স)-এর চাচা আব্বাস (রা)-এর উত্তরসূরী ছিলেন তিনি। হযরত আব্বাস (রা)-এর নামানুসারে এ রাজবংশের নাম হয় আব্বাসীয় রাজবংশ।

সিংহাসনে আরোহন ঃ আব্বাসীয় আন্দোলনের পুরোধা আবু মুসলিম যখন উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বিজয়াভিযানে লিপ্ত তখন তাঁর ভাই ইবরাহীম মারওয়ানের হাতে বন্দী হন। মারওয়ান তাঁকে হত্যা করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ভাই আবুল আব্বাসকে তাঁর উত্তরসূরী মনোনীত করে যান। ৭৪৯ খ্রিস্টাব্দে কুফার মসজিদে আবুল আব্বাস খলিফা হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। জনসাধারণ তাঁর প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে। ৭৫০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে জাবের যুদ্ধে দ্বিতীয় মারওয়ানের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে উমাইয়া বংশের পতন ঘটে। তখন থেকেই আব্বাসীয় খিলাফত শুরু হয়।

উমাইয়াদের নিধন যজ্ঞ ও ক্ষমতা সুসংহতকরণ

খিলাফত লাভের পর আবুল আব্বাস আব্বাসীয়দের ক্ষমতা সুসংহত করার প্রতি মনোনিবেশ করেন। তিনি উমাইয়াদের যুলুম-নির্যাতনের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য দৃঢ় শপথ গ্রহণ করেন। তিনি নিজেকে 'আস-সাফফাহ' বা 'রক্ত পিপাসু' খেতাবে ভূষিত করেন।

৭৫০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে উমাইয়া খলিফা মারওয়ানের পতন হলে তিনি প্রতিশোধের আগুন জ্বেলে দেন। তিনি উমাইয়া বংশকে সম্পূর্ণরূপে চিহ্নিত করার এক ভয়াবহ উন্মাদনায় মেতে ওঠেন। ইবনে খালদুন লিখেন যে, "বনু উমাইয়াদের রাজধানী দামেস্ক জয় করে আব্বাসীয় সৈন্যরা সেখানে গণহত্যা চালায়। এ হত্যাকাণ্ডে ৫০ হাজার লোক নিহত হয়। ৭০ দিন যাবত দামেস্কের উমাইয়া জামে মসজিদ ঘোড়ার আস্তাবলে পরিণত হয়েছিল। সকল বনু উমাইয়ার কবর উপড়ে ফেলা হয়। বনু উমাইয়া শিশুদেরকেও হত্যা করা হয় এবং তাদের রক্তাক্ত লাশের ওপর ফরাশ বিছিয়ে খাদ্য খাওয়া হয়। বসরায় বনু উমাইয়াদের হত্যা করে মৃতদেরকে পা ধরে টেনে এনে রাস্তায় ফেলে দেয়া হয়। সেখানে শিয়াল কুকুর তাদের লাশ ভক্ষণ করে। মক্কা মদীনায়ও তাদের সাথে এ ধরনের আচরণ করা হয়। উমাইয়াদের ধ্বংস করার জন্য সেনাপতি ও চাচা আব্দুল্লাহকে কাজে লাগায়। বসরা, মদীনা, মক্কা ও প্যালেস্টাইনের বিভিন্ন স্থানের উমাইয়া বংশের পুরুষদের শেষ করে দেয়া হয়। স্ত্রী লোকদেরকে ক্রীতদাসী রূপে গণ্য করা হয়। কেবল জীবিত উমাইয়াদের প্রতিই প্রতিশোধ নেয়া হয়নি; মৃত উমাইয়াদের থেকেও প্রতিশোধ নেবার জন্য কবর থেকে তাদের তুলে পুড়িয়ে ফেলা হয়। শুধু মুয়াবিয়া ও উমর ইবনে আব্দুল আযীযের কবর যাদের হাত থেকে কোন রকমে রক্ষা পেয়েছিল। আব্বাসীয়দের এ নিধন যজ্ঞের হাত থেকে কোন রকমে পালিয়ে গেলেন খলিফা হিশামের পৌত্র প্রথম আব্দুর রহমান (আদ-দাখিল)। তিনি স্পেনে গিয়ে মুসলিম শক্তিকে পুনর্গঠিত করে সেখানে উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এভাবে একদিকে প্রতিশোধ স্পৃহা, অপরদিকে তাদের সিংহাসনের সম্ভাব্য শত্রুদেরকে উৎখাত করে আবুল আব্বাস তাঁর ক্ষমতাকে সুসংহত করেন।

বিদ্রোহ দমন

আবুল আব্বাসের নিষ্ঠুরতা ও নির্মমতায় ক্ষুব্ধ হয়ে জনগণ তাঁর পক্ষ ত্যাগ করে বিদ্রোহ করতে থাকে। বিশেষ করে সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়া, দামেস্ক, হিমস ও প্যালেস্টাইন মুঘল, ইসরাইল এবং কিন্নিসিরিনের জনগণ আব্বাসীয়দের নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ করে। তিনি কৌশলে সকল বিদ্রোহ দমন করেন। তবে মেসোপটেমিয়ার বিদ্রোহ দমনে আবুল আব্বাসকে বেগ পেতে হয়। তিনি তাদের দমনের জন্য নিজের ভাই আবু জাফরকে সেখানে পাঠান। দীর্ঘদিন ধরে অবরোধ করে রাখার পর হারবান-এর পতন ঘটে এবং সেখানে আবু জাফর শান্তি ও শৃঙ্খলা

প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। উমাইয়া খিলাফতের পতনের পর ইরাকের উমাইয়া গভর্নর ইয়াজিদ বিন-হুবাইরা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ওয়াসিতে আশ্রয় নেন। তাকে শায়েস্তা করার জন্য আবুল আব্বাস তাঁর ভাই আবু জফর ও হাসান-বিন-কাহাতাবকে পাঠান।

রাজধানী স্থানান্তর

কুফা ছিল হযরত আলী (রা)-এর সমর্থকদের ব্যাপক অবস্থান স্থল। আবুল আব্বাস কুফাকে নিজের জন্য নিরাপদ মনে করলেন না। তিনি হীরার অনতিদূরে আনবার নামক স্থানে রাজধানী স্থানান্তর করেন। সেখানে তিনি আবুল আব্বাস আল হাশেমীর নামে রাজ প্রাসাদ তৈরি করেন। আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ সম্ভাব্য বিদ্রোহ দমন এবং রাজধানী পরিবর্তন করে আব্বাসীয় খিলাফতকে শত্রুমুক্ত ও নিরাপদ করলেন। খিলাফতের নিরাপত্তাকে আরও বলীষ্ঠ ও দৃঢ় করার জন্য তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্তা পদে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেন।

প্রশাসনে আত্মীয় ও সমর্থকদের নিয়োগ

আবুল আব্বাস প্রশাসনকে নিজের অনুকূল রাখার জন্য প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে নিজ বংশীয় আত্মীয়-স্বজন ও সমর্থকদের নিয়োগ দান করেন। এভাবে খিলাফতকে পুনরায় গোত্রীয়করণ করেন। তিনি নিজ ভাই আবু জাফরকে মেসোপটেমিয়া, আর্মেনিয়া ও আজার বাইজানের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। চাচা দাউদকে হিজাজ, ইয়ামেন ও ইয়ামামার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তাছাড়া আব্দুল্লাহকে সিরিয়ার, সুলাইমানকে বসরার শাসনকর্তা হিসেবে অধিষ্ঠিত করেন। খোরাসানে নিযুক্ত করেন বিশ্বস্ত আবু মুসলিমকে এবং মিসরে নিযুক্ত করেন আবু আইয়ুনকে। উজীরের পদে নিযুক্ত করেন আবু সালমাকে, অর্থমন্ত্রী বানান খালিদ-বিন-বার্মাককে।

মৃত্যু ঃ চার বছর তিন মাস রাজত্ব করার পর ৭৫৪ খ্রি. জুন মাসে আবুল আব্বাস তাঁর নতুন রাজধানীতে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৩০ বছর। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর ভাই আবু জাফরকে নিজ উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান।

আবুল আব্বাসের চরিত্র ও কৃতিত্ব

আব্বাসীয় বংশের প্রথম খলিফা আবুল আব্বাস আস্-সাফফাহ। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিলেন। সিংহাসনে আরোহন করার সাথে সাথে আস্-সাফফাহ উমাইয়াদেরকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালান। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ওয়েল বলেন, অর্থাৎ আবুল আব্বাস শুধু বর্বর পাষণ্ডই ছিলেন না, ভূয়া অঙ্গীকারকারী এবং কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতকও ছিলেন।

০ নিষ্ঠুরতা ঃ আবুল আব্বাস একজন নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যে কোন ধরনের কঠোরতা অবলম্বন করতে পারতেন। নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতার জন্য তাঁকে 'রক্ত পিপাসু' (আস-সাফ্ফাহ) উপাধি দেয়া হয়।

০ প্রতিশোধ স্পৃহা ঃ মানবিক দিক দিয়ে তাঁর কৃত নৃশংস কার্যাবলী নিন্দনীয় হলেও তাঁর পূর্ব পুরুষদের প্রতি উমাইয়াদের কৃত অপরাধ এবং বংশীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করতে প্রতিকূল বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এর প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায় না।

কর্তব্যপরায়ণ ও চরিত্রবান ঃ এ সকল নিষ্ঠুরতা সত্ত্বেও তিনি সদাশয়, কর্তব্যপরায়ণ এবং চরিত্রবান হিসেবেই খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর মাত্র একজন স্ত্রী ছিলেন। তিনি কোন প্রকার উপ-পত্নী গ্রহণ করেননি। নিজ পুত্র থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজ ভ্রাতা আবু জাফরকে সিংহাসনের জন্য উত্তরাধিকারী মনোনয়ন দান করে এক মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

সুশাসক ঃ নিষ্ঠুর হলেও আস্-সাফফাহ প্রজারঞ্জক শাসক ছিলেন। তিনি কুফা হতে মক্কা পর্যন্ত দীর্ঘ রাজপথ তৈরি করেন এবং হজযাত্রীদের সুবিধার জন্য রাস্তার ধারে দূর ফলক স্থাপন ও সরাইখানা নির্মাণ করেন।

জ্ঞানী-গুণীদের পৃষ্ঠপোষক ঃ আবুল আব্বাস জ্ঞানী, গুণী ও কবি সাহিত্যিকদের সমাদর করতেন এবং তাঁদের একান্ত পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর খিলাফতে ইমাম আবু হানীফা (র) সর্বপ্রথম ফিক্হ শাস্ত্রের চর্চা আরম্ভ করেন। আব্বাসীয় সিংহাসনকে কণ্টকমুক্ত করার জন্য যদিও তিনি নিষ্ঠুরতার পথ বেছে নিয়েছিলেন তথাপিও তিনি একজন সদাশয়, কর্তব্যপরায়ণ এবং প্রজাহিতৈষী শাসক ছিলেন।

সার-সংক্ষেপ

উমাইয়া বংশের পতন এবং আব্বাসীয় বংশের উত্থান ইসলামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। উমাইয়া বংশের শাসনকর্তাদের নৈতিক অধঃপতন আব্বাসীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করে। আব্বাসীয়গণ ছিলেন হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর চাচা আব্বাসের বংশধর। হযরত আব্বাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ইতিহাসে ইবনে আব্বাস নামে পরিচিত। তিনি হযরত আলী (রা)-এর একজন বড় সমর্থক ছিলেন।

ইবনে আব্বাসের (রা) মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আলী পরিবারের কর্তৃত্ব লাভ করেন। হযরত আলী ও হযরত মুয়াবিয়ার দ্বন্দ্ব, মুয়াবিয়ার কূটনীতি, প্রথম ইয়াযিদের নিষ্ঠুরতা, কারবালার নির্মম হত্যাকাণ্ড উমাইয়াদের স্বজনপ্রীতি, আলীর বংশধরদের প্রতি অবিচার প্রভৃতি কারণে আব্বাসীয়গণ মুহাম্মাদের নেতৃত্বে উমাইয়া শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে এবং শেষ পর্যন্ত উমাইয়া শাসনের পতন ঘটিয়ে আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠা করে। মুহাম্মাদ বিন আলী উমাইয়াদের বিরুদ্ধে প্রচার করতে থাকেন যে, একমাত্র আলীর বংশধররাই খিলাফতের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। ফলে আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে।

মুহাম্মদের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ইবরাহীম অত্যন্ত দক্ষতার সাথে আন্দোলন পরিচালনা করার ফলে বহু লোক এ আন্দোলনের পতাকা তলে সমবেত হয়। এভাবে উমাইয়া বিরোধী আন্দোন চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। সর্বশেষ উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ান যখন খারিজী বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত, ঠিক তখনি আবু মুসলিম নসরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। নসর যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হলে খোরাসান আবু মুসলিমের হস্তগত হয়। উমাইয়া খলিফা মারওয়ান কর্তৃক ইমাম ইবরাহীমের নৃশংস হত্যায় ক্ষুব্ধ হয়ে আব্বাসীয়গণ প্রবল আক্রমণ পরিচালনা করে উমাইয়া শাসিত বিভিন্ন অঞ্চল দখল করে নেন। ইমাম ইবরাহীমের মৃত্যুর পর আবু মুসলিম আবুল আব্বাসকে খলিফা বলে ঘোষণা করেন। আনুগত্য লাভ করে তিনি উমাইয়াদের নৃশংসতার প্রতিশোধ গ্রহণের শপথ নিয়ে আস্-সাফফাহ উপাধি গ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক যাবের যুদ্ধে মারওয়ানের পরাজয়ে উমাইয়া বংশের ভাগ্য রবি চিরতরে অস্তমিত হয়ে যায় এবং উমাইয়া খিলাফতের ধ্বংসস্তূপের ওপর আব্বাসীয়গণ খিলাফত প্রতিষ্ঠা করে নব দিগন্তের সূচনা করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৯.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (।) চিহ্ন দিন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. আব্বাসীয় খিলাফতের প্রথম খলিফার নাম-
ক. আল-আব্বাস খ. মুয়াবিয়া গ. আবুল আব্বাস ঘ. মুহাম্মদ বিন আলী

২. আস-সাফফাহ অর্থ হচ্ছে-
ক. রক্ত-পিপাসু খ. রক্ত-প্রবাহ গ. রাজতন্ত্র ঘ. স্বৈরাচারী

৩. আব্বাসীদের নিধন যজ্ঞ থেকে পালিয়ে কোন রকমে বেঁচে গিয়ে স্পেনে উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন-
ক. মুয়াবিয়া খ. ইয়াযিদ
গ. মূসা বিন নুসাইর ঘ. আবদুর রহমান আদ-দাখিল।

৪. আবুল আব্বাস তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন-
ক. আনবার নামক স্থানে খ. কুফায় গ. কারবালার গ. বাগদাদ

৫. আবুল আব্বাস ছিলেন-
ক. কুশাসক খ. স্বৈরাচারী গ. সুশাসন ঘ. অনাচারী

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. আবুল আব্বাস-আস সাফাহর পরিচয় দিন।
২. উমাইয়াদের সাথে তাঁর নীতি বর্ণনা করুন।
৩. আবুল আব্বাসের চরিত্র ও কৃতিত্ব বর্ণনা করুন।

পাঠ ৩ আল-মনসুর (৭৫৪-৭৭৫ খ্রি.)-এর খিলাফত এবং আব্বাসীয় শাসন দৃঢ়ীকরণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- আল-মনসুরের খিলাফত লাভ সম্পর্কে বলতে পারবেন
- আব্বাসীয় শাসন দৃঢ়ীকরণে তাঁর ভূমিকার বিবরণ দিতে পারবেন
- তাঁর শাসন ব্যবস্থা কেমন ছিল বর্ণনা করতে পারবেন।

আব্বাসীয় প্রথম খলিফা আবুল আব্বাস আস্-সাফফাহর বড় ভাই ছিলেন আবু জাফর আল-মনসুর। তাঁর নাম ছিল আবু জাফর। তিনি সিংহাসনে আরোহন করার পর নিজেকে আল-মনসুর (বিজয়ী) বলে ঘোষণা করেন। তখন থেকে তিনি আল-মনসুর নামে বেশি পরিচিত।

আবুল আব্বাস আস্-সাফফাহ ৭৫৪ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। এ সময় আবু জাফর হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় ছিলেন। এ কারণে আবুল আব্বাস আস-সাফফাহর মৃত্যুর পর তাঁর ভাতিজা ঈসা তাঁর অনুপস্থিতিতে আবু জাফরের নামে শপথ বাক্য পাঠ করেন। ভাইয়ের মৃত্যুর খবর শুনে আবু জাফর হজ্জ শেষে দ্রুত কুফায় ফিরে আসেন। এ সময় তিনি মসজিদ প্রান্তরে প্রথম উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন।

আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ আব্বাসীয় বংশের প্রথম শাসক। তিনি আব্বাসীয় আন্দোলনে এবং ক্ষমতা লাভ করেও একক কৃতিত্ব লাভে সক্ষম হননি। সময় স্বল্পতার কারণে আস্সাফফাহর পক্ষে আব্বাসীয় খিলাফতকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। এ অবস্থায় খলিফা আল মনসুর দূরদর্শীতা ও কূটনীতির দ্বারা অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুর মোকাবেলা করে আব্বাসীয় ফিলাফতকে সুদৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। আমীর আলী যথার্থই বলেছেন, "এ রাজ পরিবারের খলিফাগণের অপ্রতিহত ক্ষমতা এবং রাজনৈতিক প্রাধান্য লোপের পরও ইহাদের প্রভূত প্রতিপত্তি তাঁরই দূরদর্শীতার গুণে সম্ভব হয়েছিল।" একারণেই আল মনসুরকে আব্বাসীয় খিলাফতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

আব্বাসীয় শাসন দৃঢ়ীকরণে আল-মনসুরের নীতি ছিল–

১. অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করে শান্তি স্থাপন এবং রাজ্যকে সুসংহতকরণ
২. রাজ্য বিস্তারনীতি
৩. প্রশাসনিক সংস্কার

অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন

আবদুল্লাহ বিন আলীর বিদ্রোহ দমন

সিরিয়ার শাসনকর্তা আবদুল্লাহ বিন আলী জাবের যুদ্ধে উমাইয়া বাহিনীকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন। আস্-সাফফার প্রতিশ্রুতি অনুসারে তিনি উমাইয়া বংশের পতনে খিলাফত দাবি করেন। আবু জাফর আল-মনসুরকে খলিফা হিসেবে স্বীকার করতে রাজী হননি। খলিফা আল-মনসুর আবু মুসলিমকে আবদুল্লাহর বিরুদ্ধে পাঠান। আবু মুসলিম ৭৫৪ খ্রি. নাসিবীনের যুদ্ধে আবদুল্লাহকে পরাজিত করেন। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আবদুল্লাহ তার ভাই বসরার গভর্নর সুলাইমানের নিকট আশ্রয় নেন। পরবর্তী সময়ে কৌশলে পানি ও লবণ বেষ্টিত দুর্গে বন্দী করে রাখেন। পরে নির্মমভাবে আবদুল্লাহকে হত্যা করা হয়। এভাবে মনসুর আবদুল্লাহর বিদ্রোহ দমন করে নিজের অবস্থানকে সুদৃঢ় করেন।

আবু মুসলিমকে হত্যা

মনসুর আবদুল্লাহর বিদ্রোহ দমনের পর আবু মুসলিমকে খুব ভয় পেতেন। আবু মুসলিম পরবর্তী সময়ে খিলাফতের দাবিদার হতে পারে, এ আশংকায় তিনি আবু মুসলিমকে দমনের পরিকল্পনা করেন। কারণ আব্বাসীয়দের খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্যও তিনি ছয় লাখ উমাইয়াকে হত্যা করেছিলেন। তাই খোরাসানের শাসনকর্তা আবু মুসলিমকে তাঁর রাজদরবারে প্রলোভন ও আশ্বাস দিয়ে ডেকে আনেন এবং পরে গুপ্তঘাতক দ্বারা কৌশলে নিরস্ত্র আবু মুসলিমকে হত্যা করেন।

আবু মুসলিমের পরিচয়

আবু মুসলিম ছিলেন আরব বংশোদ্ভূত ইরানের অধিবাসী। প্রাথমিক জীবনে তিনি ইস্পাহানে কাটান। তিনি ছিলেন অসাধারণ বাগ্মী। তাঁর বক্তৃতায় শত্রু-মিত্র সবাই বিমোহিত হয়ে যেত। উমর ইবনে আব্দুল আযীযের খিলাফতকালে আবু মুসলিম হজ্জব্রত পালনের জন্য মক্কায় আগমন করেন। এ সময় আব্বাসীয় আন্দোলনের পূর্ব পুরুষ মুহাম্মদের সাথে তার সাক্ষাত হয়। তিনি আবু মুসলিমের শিষ্টাচার, সৌজন্যবোধ ও দূরদর্শিতা দেখে তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে নিজের কাছে রেখে দেন। মুহাম্মদ খিলাফতের বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে আবু মুসলিম এর ব্যাপারে সজাগ থাকার পরামর্শ দেন। পরে তিনি আব্বাসীয় আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন।

আবু মুসলিম খোরাসান এলাকায় প্রথমে আব্বাসীয় আন্দোলনের প্রচার কার্য শুরু করেন। তাঁর যাদুকরী বক্তৃতায় আলী, ফাতেমীয়, সুন্নী, মাওয়ালী, খারিজী প্রভৃতি দলমতের লোক সকল পার্থক্য ভুলে আবু মুসলিমের পতাকা তলে সমবেত হয়। এভাবে খোরাসান আব্বাসীয় আন্দোলনের শক্তিশালী ঘাঁটিতে রূপান্তরিত হয়। তাঁর অসাধারণ সাহস, প্রতিভা ও যোগ্যতা বলে উমাইয়াদের পতন এবং আব্বাসীয়দের উত্থান সম্ভব হয়েছিল। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্ব না পেলে আব্বাসীয়দের সাফল্য সহজ সাধ্য ছিল না। তাঁর অপরিসীম ক্ষমতা, বিপুল জনপ্রিয়তা ও অসাধারণ গুণ-বৈশিষ্ট্যের জন্য খলিফা মনসুর তাঁকে বিপজ্জনক মনে করতেন। এজন্যই ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়ে তাঁকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। আবু মুসলিম আব্বাসীয় যুগের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। ঐতিহাসিক মুর বলেন, "মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়স্ক আবু মুসলিম তাঁর অসাধারণ ধীশক্তি কর্মতৎরতা এবং বীরত্ব দ্বারা উমাইয়াদের ধ্বংসস্তূপের ওপর আব্বাসীয় বংশকে প্রতিষ্ঠিত করে ইসলামের ধ্যান-ধারণায় অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধন করেন।"

সানবাদের বিদ্রোহ দমন

আবু মুসলিমকে হত্যার পর পারস্য ও খোরাসানে তুমুল আন্দোলন শুরু হয়। আর এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন সানবাদ। খলিফা খোরাসানে বিদ্রোহ দমনের জন্য সৈন্য পাঠালে সরকারি বাহিনীর সাথে বিদ্রোহীদের তুমুল যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে সানবাদ নিহত হন। এই সময় আবু নাসের নামক আবু মুসলিমের একজন বিশ্বস্ত সহযোগী খলিফার নিকট ক্ষমা চাইলে খলিফা তাঁকে ক্ষমা করেন। এভাবে খোরাসান আব্বাসীয়দের করতলগত হয়।

রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায় দমন

রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায় মনসুরকে আল্লাহর অবতার বলে গণ্য করতেন। ৭৫৮ খ্রিস্টাব্দে রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায়ের কার্যকলাপ সম্পূর্ণ ধর্মবিরোধী মনে করে ২০০ জন রাওয়ান্দিয়াকে কারারুদ্ধ করা হয়। এর কিছুদিন পর এই সম্প্রদায়ের আরো প্রায় ৬০০ জন লোকেরা রাজদরবারে এসে খলিফার সাথে দেখা করতে চান। খলিফার সাথে দেখা করতে আসলে রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা খলিফাকে আক্রমণ করে। সৌভাগ্যবশত মায়ান বিন যায়দার হস্ত ক্ষেপের ফলে খলিফা মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান। অবশেষে খলিফা কঠোর হস্তে এই বিদ্রোহ দমন করে ইসলাম ধর্মকে ধর্মীয় কুসংস্কারের হাত হতে রক্ষা করেন।

তাবারিস্তান ও খোরাসানের গোলযোগ দমন

৭৫৯ খ্রিস্টাব্দে খোরাসানের শাসনকর্তা খলিফা মনসুরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। খলিফা এই বিদ্রোহ দমন করার জন্য তাঁর পুত্র আল-মাহদী এবং সেনাপতি খুযাইমাকে নির্দেশ দেন। বিদ্রোহীগণ আক্রমণের ভয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হয় আর বিদ্রোহী নেতা আবদুল জব্বারকে রাজ দরবারে ডেকে এনে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়; ফলে খোরাসানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী সময় ওস্তাদ শিশ বিদ্রোহ ঘোষণা করলে তাকেও দমন করা হয়। এর পর তাবারিস্তানের শাসনকর্তা ইস্পাহান্দ বিদ্রোহ ঘোষণা করলে আল-মাহদী তাকেও দমন করেন। পরে ৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে খালিদ বিন বার্মাককে খোরাসানের প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়।

ইফ্রিকিয়াতে শান্তি স্থাপন

ইফ্রিকিয়ার বর্বররা ও খারেজীগণ খলিফার কর্তৃত্ব অস্বীকার করে সেখানে বিদ্রোহ করলে খলিফা ৭৭২ খ্রিঃ তাদের দমন করেন। ইফ্রিকিয়াতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়।

আলী বংশীয়দের বিরুদ্ধে অভিযান

আলী ও ফাতেমার বংশধরগণ আব্বাসীয় আন্দোলনে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁরা ভবিষ্যতে খিলাফাত দাবি করতে পারেন এই চিন্তা করে আল-মনসুর আলী বংশীয়দের নির্মূল করার নীতি গ্রহণ করেন। তিনি ইমাম হাসানের বংশধরদের বিরুদ্ধে অমানুষিক অত্যাচার শুরু করেন। আল-মনসুর ঈসার নেতৃত্বে ইবরাহিম ও মুহাম্মদকে হত্যা করেন। তিনি হযরত ইমাম হাসান (রা) ও হুসাইন (রা)-এর স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে নেন।

মদীনাবাসীদের সকল সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালিককে কারাদণ্ড দেয়া হয়। পরে তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এমনকি ইমাম জাফর সাদিকও আব্বাসীয়দের অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাননি। মনসুরের শাসন ইতিহাসে এটা একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়।

২. রাজ্যবিস্তার ঃ তিনি সকল বিদ্রোহ এবং প্রতিপক্ষকে দমন করে সাম্রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার পর নতুন রাজ্য বিজয়ের পরিকল্পনা করেন। ৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে মনসুর সালেহ ও আব্বাসের নেতৃত্বে ৭০ হাজার সৈন্যের মুসলিম বাহিনী রোমানদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। যুদ্ধে রোমান সম্রাট চতুর্থ কনস্টানটাইন পরাজিত হয়ে মনসুরকে বার্ষিক কর দানে বাধ্য হন। তারপর তিনি সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে তাবারিস্তান ও গীলান অধিকার করেন। এছাড়া তিনি খালিদ ইবনে বার্মাকের নেতৃত্বে এশিয়া মাইনরের উপজাতীয়দের বিদ্রোহ দমন করেন। মনসুর স্পেন জয় করতে না পারলেও উত্তর আফ্রিকা বিজয়ে সক্ষম হন। তিনি জর্জিয়া, মসুল, আর্মেনিয়া ও কুর্দিস্তান সাম্রাজ্যের আওতায় নিয়ে আসতে সক্ষম হন। মনসুর মালাসিয়া দুর্গটি পুনরুদ্ধার করেন। তিনি সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য গ্রিস সীমান্তে কয়েকটি দুর্গ নির্মাণ করেন। মোটকথা তিনি স্পেন ও আফ্রিকার কিছু অংশ ছাড়া প্রায় সমগ্র আরব সাম্রাজ্য আব্বাসীয় শাসনাধীনে নিয়ে আসেন।

উত্তরাধিকারী মনোনয়ন

আব্বাসীয় প্রথম খলিফা আস্-সাফফাহ মৃত্যুর আগে ভাই মনসুরকে এবং মনসুরের পরে ভাতিজা ঈসাকে খিলাফতের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। কিন্তু খিলাফত লাভের পর মনসুর ভাইপো ঈসাকে খিলাফতের দাবি ত্যাগ করতে বাধ্য করেন। মনসুর নিজ পুত্র মুহম্মদকে আল-মাহদী উপাধি দান করে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। জনসাধারণও তা মেনে নেন।

মৃত্যু ঃ খলিফা মনসুর সাম্রাজ্যকে গড়ে তোলার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। যার ফলে তাঁর শরীর ভেঙ্গে পড়ে। তিনি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলছেন বুঝতে পেরে জীবনের শেষ দিনগুলো মক্কা শরীফে কাটানোর জন্য বাগদাদ ত্যাগ করেন। কিন্তু মক্কা পৌঁছার আগেই পথে বীর মায়মুনা নামক স্থানে ৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে ৭ অক্টোবর মৃত্যুমুখে পতিত হন। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তিনি দীর্ঘ ২২ বছর যোগ্যতা ও গৌরবের সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন।

৩. শাসন ব্যবস্থা ঃ অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হতে রাষ্ট্রকে রক্ষা করে তিনি সাম্রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সুষ্ঠু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

নিয়মিত সৈন্যবাহিনী গঠন ঃ তিনি বহিঃশত্রুর আক্রমণ হতে দেশকে রক্ষা এবং অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। তিনি সৈনিকদের উপযুক্ত বেতনের ব্যবস্থা করেন।

গোয়েন্দা বাহিনী গঠন ঃ তিনি চেয়েছিলেন দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠন করতে। দেশের ভেতরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, প্রশাসনে নিয়োজিত ব্যক্তিদের দুর্নীতি দমন করার জন্য সাম্রাজ্যের সর্বত্র গুপ্তচর নিয়োগ করেন। গুপ্তচরদের থেকে খলিফা প্রতিদিন বিভিন্ন ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতেন।

প্রদেশের সীমানা পুনঃনির্ধারণ এবং শাসকদের বদলীর ব্যবস্থা ঃ বিশাল সাম্রাজ্যকে খলিফার একার পক্ষে শাসন করা সম্ভব ছিল না। সেজন্য তিনি পুনরায় প্রদেশগুলোর সীমানা নির্ধারণ করেন। সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিদের উপর এর শাসন কার্যের দায়িত্ব অর্পণ করেন। সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালনা এবং জনস্বার্থে গভর্নর ও কর্মচারীদের বদলী করতেন।

ন্যায়বিচার প্রবর্তন ঃ তিনি তাঁর সাম্রাজ্যে ন্যায়বিচার প্রবর্তনের জন্য কাজী নিয়োগ করতেন। কাজীগণ আইন অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। তাঁরা বিচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ছিলেন। মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান বিশ বছর যাবত বাগদাদের কাজী হিসেবে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন। কাজীর বিচার শোনার জন্য মাঝে মাঝে সুলতান সাধারণ দর্শকের মত বসে রায় শুনতেন, কাজী একবারও বিচারকার্য চলার সময় দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মান করতেন না।

শিক্ষা সংস্কার ঃ তিনি একজন শিক্ষা ও জ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আব্বাসীয় খিলাফত শিক্ষা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে কৃতিত্ব অর্জন করে, তার প্রথম ভিত্তি স্থাপন করেন খলিফা আল-মনসুর। তিনি রাজ্যে অনেক মসজিদ, মক্তব ও মাদরাসা স্থাপন করেন। শিক্ষকদের যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন। তাছাড়া তিনি নিজেও একজন গণিত ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের পণ্ডিত হিসেবে সুনাম অর্জন করেন।

অনুবাদ কর্ম ঃ অনুবাদ শাখায়ও তাঁর যথেষ্ট অবদান ছিল। তাঁর দরবারে অসংখ্য গুণীজনের সমাবেশ হত। তিনি জ্ঞানী ও গুণীজনদের সাহায্য ও সহযোগিতায় গ্রিক, পারসিক, সংস্কৃতিসহ আরও অনেক ভাষায় লিখিত প্রয়োজনীয় গ্রন্থসমূহ আরবি ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করেন।

জনকল্যাণ ঃ জনগণের কল্যাণের জন্য খলিফা আল-মনসুর অনেক নগর, সরাইখানা, রাস্তাঘাট, হাসপাতাল স্থাপন করেছিলেন। তাঁর সময়ে কৃষিকাজের ব্যাপক উন্নতি হয়। ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসার ঘটে।

বাগদাদ নগরীর প্রতিষ্ঠাতা ঃ আল-মনসুর তাঁর কৃতিত্বকে অক্ষয় ও অম্লান করার জন্য বাগদাদে নতুন নগরী স্থাপন করেন। এটা অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর এবং অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ দজলা-ফোরাত নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। মনসুরের নামানুসারে এর নামকরণ করা হয় মানসুরিয়া। এটা নির্মাণে ১ লক্ষ লোকের (৭৬২-৭৭৬) ৪ বছর সময় লাগে। এতে ব্যয় হয় ৪৮,৮৩,০০০ দিরহাম। এই নতুন নগরী সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ছিল। নগরীর কেন্দ্রস্থলে ছিল রাজপ্রাসাদ, জুমআ মসজিদ, মনোরম উদ্যান, কৃত্রিম ফোয়ারা। রূপকথার ঐশ্বর্যময়ী বাগদাদ ছিল তৎকালীন বিশ্বের বিস্ময়। কালক্রমে বাগদাদ সারা বিশ্বের জ্ঞান-গরিমা, শিক্ষা-সভ্যতা ও বাণিজ্যের কেন্দ্রে পরিণত হয়।

সার-সংক্ষেপ

উমাইয়া খিলাফতের পতনের পর ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে আবুল আব্বাস ও আবু মুসলিমের নেতৃত্বে আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। আবুল আব্বাস আস সাফফাহ আব্বাসীয়দের প্রথম শাসক হলেও সময়ের স্বল্পতার কারণে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব রেখে যেতে পারেননি। খলিফা আল-মনসুর সে অভাব পুরন করেন। প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে যে সব কাজ করা দরকার আল মানুসর তা সবই করেছেন। এজন্য তাঁকে আব্বাসীয় খিলাফতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। তিনি নিজ বংশকে ক্ষমতায় টিকে রাখার জন্য সম্ভব্য সকল শত্রুকে বিনাশ করেন। তিনি সকল বিদ্রোহ কঠোর হাতে দমন করেন। আব্বাসীয় শাসন দৃঢ়ীকরণে তিনি প্রথমত অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করে সামাজ্যের সর্বত্র শান্তি স্থাপন ও রাজ্যকে সুসংহত করেন। দ্বিতীয়ত প্রশাসনিক সংস্কার সাধন করে শাসন ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা বিধান করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৯.৩

মিল করুন

১. আবুল আব্বাস আস্-সাফফাহর বড় ভাই।	১. তাঁর ভাতিজা ঈসা।
২. আবু জাফর অনুপস্থিতিতে তাঁকে খলিফা বলে ঘোষণা করেন।	২. রাওয়ান্দিয়ার ৬০০ জন লোক দেখা করতে আসে।
৩. মনসুরে মানে	৩. আল-মানসুর
৪. নিরস্ত্র আবু মুসলিমকে হত্যা করেন।	৪. সানবাদ
৫. পারস্য ও খোরাসানে বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন।	৫. আবু জাফর আল-মানসুর।
৬. খলিফা মনসুরকে রাজ দরবারে আক্রমণ করেন।	৬. বিজয়ী।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. আবু জাফর আল-মনসুর কে ছিলেন? তাঁকে আব্বাসীয় খিলাফতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা বলা হয় কেন?
২. অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনে আল-মনসুরের পদক্ষেপ বর্ণনা করুন।
৩. আবু মুসলিম কে ছিলেন?
৪. মনসুরের বিদ্রোহ দমন নীতি বর্ণনা করুন।
৫. আল মনসুরের শাসন ব্যবস্থা তুলে ধরুন।

খলিফা আল-মনসুরের চরিত্র ও কৃতিত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- খলিফা আল-মনসুরের চরিত্র বর্ণনা করতে পারবেন
- খলিফা আল-মনসুরের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন

আল-মনসুরের চরিত্র

মনসুরের ব্যক্তিগত জীবন ছিল সুন্দর, নির্মল ও পবিত্র। তিনি ছিলেন একদিকে ন্যায়পরায়ণ, ধার্মিক, পরিশ্রমী, ধৈর্যশীল, দূরদর্শী এবং জনদরদী। তিনি তাঁর বন্ধুদের প্রতি ছিলেন খুবই কোমল আর শত্রুদের প্রতি ছিলেন কঠোর ও নির্মম।

তাঁর চরিত্রে ছিল দোষ ও গুণের অপূর্ব সংমিশ্রণ। মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু, কোমল ও আদর্শ স্থানীয়। কোন রকম পাপ-পঙ্কিলতা তাঁর চরিত্রকে কলুষিত করতে পারেনি। তাঁর দরবারে অধর্মাচরণের কোন স্থান ছিল না। ন্যায়নিষ্ঠা, মিতব্যয়িতা, কর্মতৎপরতা ও প্রজাসাধারণের প্রতি দরদী মন তাঁকে সদা কর্মচঞ্চল করে রাখত।

মৃত্যুর সময় মনসুর নিজপুত্র আল-মাহদীকে যে শেষ উপদেশ দিয়ে যান– তা তাঁর অভিজ্ঞতা, মহান চরিত্র ও উন্নত শাসন দক্ষতার পরিচয় বহন করে। তিনি বলেন– "যা আজ করতে হবে, তা আগামী কালের জন্য ফেলে রেখো না। জনসাধারণ ও সেনাবাহিনীকে খুশি রেখো। ..... তোমার ধনাগার কখনও শূন্য রেখো না। তোমার কর্তব্য কাজ নিজেই সম্পাদন কর। .... তোমার বন্ধুবর্গ ও আত্মীয়-স্বজনকে কখনও অবহেলা করো না। ধর্মপরায়ণতা ছাড়া আর কিছুই খলিফাকে গুণবান করে না। কর্তব্যপরায়ণতা ব্যতিরেকে আর কিছুই খলিফার শোভা পায় না। ন্যায়পরায়ণতা ছাড়া জনসাধারণের সংস্কার সাধন করা যায় না। ..... সম্যক চিন্তা না করে কোন কাজে অগ্রসর হয়ো না। কৃতজ্ঞতা দ্বারা বদান্যতা, ক্ষমা দ্বারা ক্ষমতা, মনোহরী স্নেহ দ্বারা বাধ্যতা এবং বিনয় ও তিতিক্ষা দ্বারা বিজয় অক্ষুণ্ন রাখবে।"

তাঁর চরিত্রে কোমলতার পাশাপাশি নিষ্ঠুরতাও ছিল। নিজের বংশকে খিলাফতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি সম্ভাব্য সকল শত্রুকে সমূলে বিনাশ করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। তিনি আলী বংশীয়দের, আবু মুসলিম খোরাসানী এবং আবদুল্লাহ বিন-আলীর প্রতি যে নৃশংস ব্যবহার করেন তার তুলনা দুনিয়াতে বিরল। ছলে বলে ও কৌশলে ঈসাকেও তিনি সিংহাসনের দাবি থেকে বিরত রাখতে বাধ্য করেন। তাঁর চরিত্রে নিষ্ঠুরতা না থাকলে তিনি হয়ত আব্বাসীয় খিলাফতকে সুদৃঢ় করতে পারতেন না ব্যক্তিস্বার্থের চেয়ে রাষ্ট্রীয়, স্বার্থ-তাঁর কাছে বড় ছিল। তাই আব্বাসীয় শাসনকে দৃঢ় করার জন্য তাঁকে কঠোরতা অবলম্বন করতে হয়েছে। ঐতিহাসিক আমীর আলী বলেন- নিষ্ঠুর, স্বার্থপর এবং অবিবেচক মনসুর নিজের অথবা বংশের স্বার্থে বিপজ্জনক মনে করলে কাউকে রেহাই দিতেন না।"

ইমাম জাফর আস সাদেক, ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালিকের প্রতি তাঁর নিষ্ঠুর ব্যবহার মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতি ও হৃদয়কে ব্যথিত করেছে।

আল-মনসুর কৃতিত্ব

আব্বাসীয় বংশের প্রকৃত স্থপতি ঃ আব্বাসীয় বংশের প্রথম খলিফা আবুল আব্বাস আস্-সাফফাহ হলেও তিনি সময়ের অভাবে তাঁর বংশকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে যেতে পারেননি। খলিফা মনসুর সুদৃঢ় হাতে বিদ্রোহ দমন করে সাম্রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা ও সংহতি ফিরিয়ে আনেন। সাম্রাজ্য বিস্তার, সার্বভৌমত্বের সম্প্রসারণ, সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা দ্বারা সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব এবং নিরাপত্তা বিধান করেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও শিক্ষা-দীক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা দ্বারা সভ্যতার উন্মেষ সাধন করে আব্বাসীয় খিলাফতকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। এ সব দিক বিবেচনা করে খলিফা আল-মনসুরকে আব্বাসীয় বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ ঃ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ ও শাসক হিসেবে খলিফা মনসুর ছিলেন সে যুগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও সর্বশ্রেষ্ঠ। খলিফা জানতেন একদিন না একদিন আব্বাসীয় বংশের পতন হবে। কাজেই তিনি তাঁর বংশের স্থায়িত্বের জন্য খলিফার পার্থিব ক্ষমতার সাথে জনতার আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় সুন্নী মতবাদ রাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত হয়। তাঁর উৎসাহে হানাফী ও মালিকী মাযহাব গড়ে উঠে।

ন্যায় বিচার ঃ আল-মনসুর ছিলেন ন্যায়বান শাসক। তাঁর ন্যায়বিচার ও ন্যায়দূর্শিতা ছিল প্রশংসনীয়। একবার কয়েকজন উটের মালিকের অভিযোগে মদীনার কাজী খলিফা মনসুরকে তাঁর বিচারালয়ে হাজির হতে বলেন। মনসুর বিনা দ্বিধায় কাযীর বিচারালয়ে উপস্থিত হয়ে সাধারণ আসামীদের ন্যায় কাজীর সামনে দাঁড়ান। বিচারে মনসুর দোষী সাব্যস্ত হয়। মনসুর কাজীর সৎসাহসের জন্য ধন্যবাদ জানান ও তাঁকে প্রচুর অর্থ দ্বারা পুরস্কৃত করেন।

শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতিষ্ঠাতা ঃ আবুল আব্বাসের মৃত্যুর সাথে সাথে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠে। আবুল আব্বাসের নিষ্ঠুরতার জন্য লোকজন আব্বাসীয়দের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিল। মনসুর এসে সকল অসন্তোষ দূর করে আব্বাসীয় বংশের নিরাপত্তা এবং সাম্রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন।

দৈনন্দিন কর্মসূচি ঃ খলিফা মনসুর সুদীর্ঘ ২২ বছর খিলাফতের দায়িত্বে ছিলেন। দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে তিনি কোন রকম অবহেলা করতেন না, নিয়মিতভাবে তিনি রাজকার্য তদারক করতেন। সকালের দিকে তিনি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের খবরাদি জানতেন এবং প্রয়োজনীয় আদেশ-নিষেধ জারি করতেন। রাজকার্যের প্রত্যেকটি বিষয় তিনি স্বয়ং দেখাশুনা করতেন। বিশেষ করে তত্ত্বাবধায়কদের হিসাব-নিকাশ তিনি কড়াকড়িভাবে তদারক করতেন। এমনকি দিরহামের কানাকড়ি পরীক্ষা করে দেখতেন, এজন্য তাঁকে 'আদ্দাওয়ানিকী' উপাধি দেয়া হয়েছিল।

বিজেতা হিসেবে ঃ অভ্যন্তরীণ সংহতি ও শৃঙ্খলা এনে খলিফা মনসুর রাজ্য বিস্তারে মনোযোগ দেন। তিনি রোমান সম্রাট চতুর্থ কনস্টানটাইনকে ৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে পরাজিত করে মালাসিয় দুর্গ পুনরুদ্ধার করেন। তিনি গ্রিক সীমান্তে নতুন দুর্গ নির্মাণ করেন। তিনি তাবারিস্তান, আর্মেনিয়া, কুর্দিস্তান ও উত্তর আফ্রিকা জয় করে তাঁর শাসনাধীনে নিয়ে আসেন।

জনসাধারণের কল্যাণ সাধন ঃ খলিফা মনসুর জনসাধারণের হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। জনসাধারণের কল্যাণের জন্য বহু নগর, সরাইখানা, চিকিৎসালয়, রাস্তাঘাট নির্মাণ করেন।

সুন্নী মতবাদের পৃষ্ঠপোষক ঃ খলিফা মনসুর ছিলেন দূরদর্শী বিদ্বান এবং ধর্মপরায়ণ। তিনি রাজনৈতিক নেতৃত্বের সাথে ধর্মীয় নেতৃত্বের সংযোগ স্থাপন করেন। এতে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর দৃষ্টিতে খিলাফতের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। তিনি সুন্নী মতাদর্শের ভিত্তি স্থাপন করেন।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ঃ খলিফা মনসুরের সময় হতে মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাসে সোনালী যুগের সূচনা হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিপুল সম্পদ সংগ্রহ করে মুসলমানগণ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে চরম উৎকর্ষ লাভ করে এর তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। তাঁর সময়ে সাহিত্য, ইতিহাস, গণিত, চিকিৎসা, দর্শন ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের গভীর চর্চা শুরু হয়। তাঁর আদেশে গ্রিক ও ভারতীয় পণ্ডিতদের দু□*প্য* গ্রন্থাবলী অনুদিত হয়। মনসুরের উদার পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলমান পণ্ডিতগণ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ ঘটান।

স্থাপত্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ঃ খলিফা মনসুরের খিলাফত মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের উন্মেষ ঘটে। মধ্যযুগের বিশ্বসভ্যতার চারণভূমি সৌন্দর্যের নগরী বাগদাদ প্রতিষ্ঠা তাঁর অমর কীর্তি। তা ছাড়া কুফা ও বসরা নগরীর প্রাচীর, রুসাফা নামক রাজপ্রাসাদ তাঁর উন্নত শিল্প মনের পরিচয় বহন করে।

সার-সংক্ষেপ

আব্বাসীয় বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা খলিফা আবু জাফর আল-মনসুরের চরিত্র ছিল দোষেগুণে মিশ্রিত। তাঁর চরিত্রে কোমলতার পাশা-পাশি নিষ্ঠুরতার সমাবেশ ঘটে ছিল। মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক ও আদর্শ স্থানীয়। ন্যায়-নিষ্ঠা, মিতব্যয়িতা, কর্মতৎপরতা এবং প্রজাবাৎসল্য গুণে তিনি গুণান্বিত ছিলেন। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকত ছিলেন। একজন সুশাসক, বিজয়ী, নির্মাতা,হিসেবে মনসুরের কৃতিত্ব ছিল অসাধারণ। ন্যায়পরতা, কর্তব্যপরায়নতা বিদ্যানুরাগী হিসেবে তাঁর জুড়ি নেই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৯.৪

১. খলিফা মনসুরের ব্যক্তিগত জীবন কেমন ছিল?
২. তাঁর চরিত্রে ছিল দোষগুণের অপূর্ব সংমিশ্রণ- ব্যাখ্যা করুন।
৩. মৃত্যুর সময়ে তিনি তাঁর পুত্র আল-মাহদীকে যে উপদেশ দিয়েচিলেন- তা কি ছিল?
৪. 'তাঁর চরিত্রে কোমলতার পাশা-পাশি নিষ্ঠুরতা ও ছিল" মন্তব্য করুন।
৫. ইমাম জাফর সাদেক, ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিকের সাথে তাঁর ব্যবহার কেমন ছিল?
৬. আল-মানসুর ছিলেন ন্যায় বিচারক- এ ব্যাপারে তাঁর জীবনের একটি ঘটনা উল্লেখ করুন।
৭. খলিফা মনসুরের দৈনন্দিন কর্মসূচি কি ছিল?
৮. জনসাধারণের কল্যাণ সাধনে মনসুরের কয়েকটি কাজের উল্লেখ করুন।
৯. জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও শিক্ষা-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হিসেবে মনসুরের মূল্যায়ন করুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. খলিফা আল-মনসুরের চরিত্র বর্ণনা করুন।
২. খলিফা আল-মনসুরের কৃতিত্বের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো বিশ্লেষণ করুন।

পাঠ ৬ খলিফা হারুন-অর-রশিদ (৭৮৬-৮০৯ খ্রি.)-এর খিলাফত লাভ এবং তাঁর অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- খলিফা হারুন অর রশিদ-এর খিলাফত লাভ সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন
- খলিফা হারুন অর রশিদের অভ্যন্তরীণ নীতি বিশ্লেষণ করতে পারবেন
- খলিফা হারুন অর রশিদের বৈদেশিক নীতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পরিচয়

বিশ্ব ইতিহাসে যে কয়জন শাসকের নাম সোনালী গৌরবে সমুজ্জ্বল, আব্বাসীয় খলিফা হারুন-অর-রশিদ তাঁদের অন্যতম। কিংবদন্তি সহস্র রজনীর বাগদাদের স্রষ্টা এই হারুন-অর-রশিদ। তাঁর খিলাফত কালে সকল দিক দিয়েই ইসলামের ইতিহাসে এক সোনালী অধ্যায়ের সূচনা হয়। তাঁর সমসাময়িক রাজা-বাদশাহের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সমরকুশলী, প্রজারঞ্জক, সুশাসক এবং বিদ্যোৎসাহী। সর্বদিক দিয়ে তাঁর খিলাফতকাল ছিল আব্বাসীয় রাজত্বের স্বর্ণযুগ।

খিলাফত লাভ ও প্রাথমিক কার্যাবলী

হারুন-অর-রশিদ ভ্রাতা হাদীর মৃত্যুর পর মাত্র ২৫ বছর বয়সে ৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদের সিংহাসনে বসেন। তাঁর খিলাফত লাভের পরে হারুন তাঁর মা খায়জুরানকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন। তাঁর মা ছিলেন ইয়াহিয়া বিন-খালিদ বার্মেকীর পৃষ্ঠপোষক। এজন্য হাদী তাঁর মাকে সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করেছিলেন এবং ইয়াহিয়া বার্মেকীকে কারারুদ্ধ রেখেছিলেন। হারুন তাঁর বাল্য শিক্ষক ইয়াহিয়া বিন খালিদ বার্মেকীকে মায়ের ইচ্ছানুসারে সসম্মানে মুক্তি দেন এবং উজীর পদে নিয়োগ করেন। বার্মেকীর দুই পুত্র ফজল ও জাফরকে উচ্চ রাজপদ দান করেন। হারুনের মা খায়জুরানের পৃষ্ঠপোষকতায় বার্মেকী পরিবার হারুনের রাজত্বে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান দখল করে রাখে।

অভ্যন্তরীণ নীতি

হারুন-অর-রশিদ খিলাফত লাভের পর অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলার সম্মুখীন হন। তিনি ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা ও সংহতি প্রতিষ্ঠার দিকে মনোযোগ দেন। এজন্য তিনি দমন নীতি গ্রহণ করেন। যেমন–

খারিজি বিদ্রোহ দমন

হারুন-অর-রশিদ সিংহাসনে বসার পর প্রথমে খারিজিদের বিদ্রোহের কবলে পড়েন। খারিজিরা বারবার বিদ্রোহ ও গোলযোগ সৃষ্টি করে সাম্রাজ্যের শান্তি বিনষ্ট করে। প্রথমে ৭৮৭-৮৮ খ্রিস্টাব্দে মসুলে খারিজি বিদ্রোহ দেখা দেয়। তারা মেসোপটেমিয়ার রাজধানী দখল করে নেয়। মেসোপটেমিয়ার আব্বাসীয় শাসনকর্তা আবু হুরাইরা এ বিদ্রোহ দমন করতে না পারায় খলিফা তাঁকে হত্যার আদেশ দেন।

খারিজি নেতা ওয়ালিদ-বিন তারিকের নেতৃত্বে খারিজিগণ আর্মেনিয়া ও আজারবাইযানে ব্যাপক গোলযোগ সৃষ্টি করে। ৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে খলিফা হারুন এক বিশাল বাহিনী পাঠিয়ে ওয়ালিদকে পরাজিত ও নিহত করেন। ওয়ালিদের নিহত হওয়ার পর তাঁর বোন লায়লা খারিজিদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। লায়লার নেতৃত্বে খারিজিরা ইরাকে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দেয়। বারবার খলিফার বাহিনী তাঁর কাছে পরাজিত হয়। অবশেষে বীরশ্রেষ্ঠ লায়লা খলিফার জনৈক সেনাপতির প্রচেষ্টায় পারিবারিক জীবনে ফিরে গেলে খারিজি বিদ্রোহের সমাপ্তি ঘটে। বীরত্বের জন্য লায়লা ইতিহাসে 'আরবীয় জোয়ান অব আর্ক' (Joan of Arc) নামে খ্যাতি লাভ করেন। শোকাভিভূত লায়লা ভাইয়ের রোমাঞ্চকর অভিযানের শোকগাঁথা রচনা করে কবি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

পারস্যের খারিজিদের দমন ঃ ৭৯৬-৯৭ খ্রিস্টাব্দে অপর একটি খারিজি বিদ্রোহ পারস্য অঞ্চলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। সেখানকার শাসনকর্তা আলী ইবনে ঈসা তা কঠোরভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেন। এভাবে খলিফা হারুন খারিজি বিদ্রোহ দমন করে সাম্রাজ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনেন।

মধ্য এশিয়ায় শান্তি স্থাপন ঃ ৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে গোটা কাবুল ও সানবাদ আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের অধীনে আসে। এ সময় মুসলিম সাম্রাজ্য হিন্দুকুশ পর্বত পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। তারপর খলিফা এশিয়া মাইনরের সীমান্ত অঞ্চলগুলোকে সাধারণ প্রদেশসমূহ হতে আলাদা করে 'আওয়াসিম' বা 'সুরক্ষিত এলাকা' নাম দিয়ে একে একজন সামরিক শাসনকর্তার হাতে ন্যস্ত করেন। তিনি সিরিয়ার সাসে পুনরায় বসতি স্থাপন করে একে একটি সুরক্ষিত দুর্গে পরিণত করেন।

আলীপন্থীদের প্রতি তাঁর নীতি ঃ আব্বাসীয় খিলাফতে আলীপন্থীদের বিরোধিতা ন্যায়সঙ্গত ছিল। কারণ তারা আল-আব্বাস ও আল-মনসুর কর্তৃক প্রতারিত ও নির্যাতিত হয়েছিল। আল-মনসুর ইবরাহীম ও মুহাম্মাদকে হত্যা করলে তাদের ছোট ভাই ইয়াহইয়া দাইলাম এলাকায় আত্মগোপন করে থাকেন। খলিফা হারুনের সময়ে ইয়াহইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। খলিফা পারস্যের শাসনকর্তা ফজল বার্মাকীকে দিয়ে তাকে দমন করার চেষ্টা করেন।

ইয়াহইয়াকে বন্দীকরণ ঃ বার্মাকী পরিবার আলীপন্থীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। তাই ইয়াহইয়াকে খলিফার বশ্যতা স্বীকার করতে বলা হয়। এক চুক্তিতে খলিফা হারুনের সাথে ইয়াহইয়ার মৈত্রী স্থাপিত হয়। কিন্তু খলিফা হারুন বিদ্রোহের সমস্ত সম্ভাব্য উৎসকে নির্মূল করার জন্য ইয়াহইয়াকে বন্দী করে রাখেন।

শিয়াদের বিদ্রোহের ভয়ে হারুন সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধক ও মহাপণ্ডিত ইমাম মূসা আল-কাযিমকে পর্যন্ত বন্দী করে বাগদাদের সিন্ধি-ইবন-শাহিকের বোনের পাহারায় রাখেন। কয়েক বছর কারাভোগ করার পর তিনি ৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে ইনতিকাল করেন। ইমাম মূসা আল-কাযিমের ইনতিকালের পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র আলী আলতায় শিয়াদের পরবর্তী ইমাম নিযুক্ত হন।

মুদারীয় ও হিমারীয়দের প্রতি দমননীতি ঃ ৭৯২ খ্রিস্টাব্দে মুদারীয় ও হিমারীয়দের মধ্যে সিরিয়া ও সিন্ধু অঞ্চলে গৃহযুদ্ধ দেখা দেয়। খলিফা হারুন সেনাপতি মূসার দ্বারা সিরিয়ার এবং সেনাপতি দাউদের দ্বারা সিন্ধু প্রদেশের বিদ্রোহ দমন করে শান্তি আনয়ন করেন।

মসুলের বিদ্রোহ দমন ঃ ৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে আতাফের নেতৃত্বে মসুলে বিদ্রোহ দেখা দিলে খলিফা নিজেই সেনাবাহিনী পরিচালনা করে তাকে দমন করেন। খলিফা তাদের শাস্তিস্বরূপ মসুলের প্রাচীরগুলো ভেঙ্গে দেন।

খাজার বিদ্রোহ দমন ঃ ৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে গ্রীকদের প্ররোচনায় খাজার উপজাতিরা আর্মেনিয়া আক্রমণ করে। খলিফা হারুন দুজন দক্ষ সেনাপতি পাঠিয়ে তাদেরকে কঠোর হাতে দমন করেন।

আফ্রিকায় আগলাবীয় শাসন প্রতিষ্ঠা ঃ খলিফা হাদীর সময়ে ৭৮৫-৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে উত্তর আফ্রিকার তানজিয়ারে আলী বংশীয় ইদরীস নামে এক ব্যক্তি স্পেনে ইদরিসীয় বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। সে সময় থেকে আব্বাসীয় শাসন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এলাকাটি স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। আফ্রিকার আব্বাসীয় শাসনকর্তাগণ বহুবার চেষ্টা চালিয়েও তা পুনরুদ্ধার করতে ব্যর্থ হন। খলিফা হারুন ৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর সেনাপতি হারসামাকে উত্তর আফ্রিকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। হারসামা প্রায় তিন বছর যোগ্যতার সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করে তিনি সেখানে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন।

এ সময়ে দক্ষিণ আলজেরিয়ার জাব অঞ্চলের শাসনকর্তা ইবরাহিম-ইবনে- আগলাব পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে খলিফার প্রিয়ভাজন হন। তিনি খলিফা হারুনের নিকট প্রস্তাব দেন উক্ত প্রদেশের শাসনভার যদি তাঁর বংশধরদেরকে স্থায়ীভাবে দেয়া হয়, তবে তিনি শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করবেন এবং বার্ষিক ৪০ হাজার দীনার বশ্যতামূলক 'কর' হিসেবে বাগদাদকে দেবেন। দূরদর্শী হারুন উত্তর আফ্রিকার ব্যয়-বহুল শাসনের কথা বিবেচনা

করে এবং স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আফ্রিকান আগলাবীয় বংশের হাতে উত্তর আফ্রিকার শাসনভার অর্পণ করেন। তখন থেকে উত্তর আফ্রিকা একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রদেশে পরিণত হয়।

হারুনের বৈদেশিক নীতি

বাইজানটাইনদের সাথে যুদ্ধ ঃ এটা ছিল হারুনের রাজত্বে একটা চমৎকার ঘটনা। তাঁর পিতার রাজত্বকালেই হারুন বাইজানটাইন সম্রাজ্ঞী আইরিনকে পরাজিত করে কর প্রদানে বাধ্য করেছিলেন। কিন্তু নতুন সম্রাট নাইসিফোরাস খলিফার নিকট এক অপমানজনক পত্রে তাঁর পূর্ববর্তী সম্রাজ্ঞীর প্রদত্ত সমুদয় করের দ্বিগুণ অর্থ দাবি করেন। খলিফা হারুন এতে ক্ষুব্ধ হয়ে বিশাল বাহিনী নিয়ে নাইসিফোরাসকে পরাজিত ও কর প্রদানে বাধ্য করেন। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক নাইসিফোরাস তিনবার চুক্তিভঙ্গ করে। খলিফা প্রত্যেকবারই তাঁকে পরাজিত করেন এবং তাঁর সন্ধির প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। তৃতীয়বারে বর্ধিত কর ছাড়াও নাইস ফোরাস ও তার পরিবারের প্রত্যেক সদস্য কর দিতে বাধ্য হন। নাইসিফোরাসকে বার বার ক্ষমা প্রদর্শন একদিকে খলিফার মহানুভবতার পরিচয় বহন করে অপরদিকে এটা তাঁর চরম অদূরদর্শিতার পরিচয় বহন করে। মুর বলেন– "হারুন ঘন ঘন অন্যত্র ব্যস্ত থাকলে নাইসিফোরাস তাঁর সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করেন এবং প্রতিবারেই পরাজিত হন। নাইসিফোরাস ধৃষ্ঠতা, কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা করলেও খলিফা হারুন প্রতিবারেই তাঁকে ক্ষমা প্রদর্শন করে অদূরদর্শিতার পরিচয় দেন।"

কূটনৈতিক সম্পর্ক ঃ হারুন-অর-রশিদের সুনাম সুখ্যাতি তৎকালীন বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু রাজন্যবর্গের সাথে তিনি কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। চীন সম্রাট 'ফাগফুর' দূত প্রেরণ করে তাঁর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। তিনি ভারতের সাথেও দূত ও উপঢৌকন আদান-প্রদান করেন। ফ্রান্সের রাজা শার্লিমেনের সাথে তিনি কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। হারুন শার্লিমেনকে একটি অত্যাশ্চর্য কারুকার্য খচিত পানিঘড়ি উপহার দিয়েছিলেন।

সার-সংক্ষেপ

কিংবদন্তির সহস্র রজনীর বাগদানের স্রষ্টা হারুন-অর-রশিদ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রাজন্যবর্গের অন্যতম। তাঁর আমলে সকল দিক দিয়েই ইসলামের ইতিহাস এবং সোনালী অধ্যায়ের সূচনা করে। তিনি খলিফা আল-হাদীর মৃত্যুরপর ৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে ২৫ বছর বয়সে বাগদাদের সিংহাসনে বসেন। তিনি তাঁর মায়ের ইচ্ছানুসারে বার্মাকী পরিবারের প্রতি সদয় হন। তিন কঠোর হাতে বিভিন্ন বিদ্রোহ দমন করে রাষ্ট্রের অভ্যণএর শান্তি স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনেন। কিন্তু বাইজানটাইন সম্রাট নাইসিফোরাসের বিশ্বাসঘাতকতা ও ধৃষ্টতা প্রদর্শনের কারণে তিনি যুদ্ধনীতি গ্রহণ করেন। তাঁর যুদ্ধ নীতিও ছিল শান্তি মিশন। তার প্রমাণ পাওয়া যায়- নাইসিফোরাস বারবার সন্ধি ও বিশ্বাস ঘাকতার পরও তার সাথে সন্ধি স্থাপন। তিনি একজন সফল কুটনৈতিকও ছিলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৯.৫

সত্যমিথ্যা নির্ণয় করুন

১. হারুন-অর-রশিদ মাত্র ২৫ বছর বয়সে ৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদের সিংহাসনে বসেন।
২. ৭৮৭-৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে খারিজি বিদ্রোহ দেখা দেয়।
৩. ওয়ালিদ-বিন-তারিক ছিলেন একজন খারিজি নেতা।
৪. বীরত্বের জন্য ইতিহাসে লায়লা 'আরবীয় জোয়ান অব আর্ক' নামে খ্যাতি লাভ করেন।
৫. আলী বংশীয় লোকেরা আব্বাসীয়দের দ্বারা প্রতারিত ও নির্যাতিত হয়েছিল।
৬. নাইসিফোরাসকে বারবার ক্ষমা প্রদর্শন হারুন-অর-রশিদের অদূরদর্শিতার পরিচয় বহন করেন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. খলিফা হারুন-অর-রশিদের পরিচয় ও খিলাফত লাভের বিষয়ে বর্ণনা করুন।
২. হারুন-অর-রশিদের অভ্যন্তরীণ নীতি কি ছিল?
৩. হারুন-অর-রশিদের বৈদেশিক নীতি বর্ণনা করুন।

পাঠ ৬ হারুন-অর-রশিদ-এর কৃতিত্ব ও চরিত্র

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- খলিফা হারুন অর রশিদের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন
- খলিফা হারুন অর রশিদের চরিত্র বর্ণনা করতে পারবেন।

কৃতিত্ব

হারুন অর রশিদ আব্বাসীয় খলিফাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তৎকালীন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নরপতিগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালকে ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ বলা হয়।

শ্রেষ্ঠ নরপতি ঃ খলিফা হারুন একজন উদার, সদাশয়, ন্যায়বিচারক ও প্রজারঞ্জক শাসক ছিলেন। অন্যায়কারী ও বিদ্রোহীদের প্রতি তিনি যেমন ছিলেন কঠোর, তেমনি গরিব-দুঃস্থদের প্রতি ছিলেন সহানুভূতিশীল।

সমর কুশলী ঃ যোদ্ধা হিসেবেও হারুন অশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আব্বাসীয় খিলাফতকে বিপদমুক্ত করার জন্য তিনি একটি বিশাল ও সুদক্ষ সেনাবাহিনী গঠন করেন। অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহ দমন করার জন্য তিনি দক্ষতা ও রণ কুশলতার পরিচয় দেন। তিনি নিজেও সৈন্য পরিচালনা করেন।

শাসন ব্যবস্থা ঃ দীর্ঘ তেইশ বছরকাল হারুন-অর-রশিদ আব্বাসীয় খিলাফতের শাসন দণ্ড দৃঢ়হস্তে পরিচালনা করেন। হারুন খিলাফতের সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার গুরু দায়িত্ব পারস্যের বিখ্যাত বার্মাকী পরিবারের উপর ন্যস্ত করেন। তিনি ইসলামের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন।

জনহিতকর কার্যাবলী ঃ অরাজকতা দমন এবং প্রজাদের অবস্থা স্বয়ং অবগত হবার জন্য তিনি ছন্দবেশে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করতেন। জনসাধারণের সুবিধার্থে খলিফা সাম্রাজ্যের সর্বত্র অসংখ্য স্কুল, মাদরাসা, মসজিদ, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট প্রভৃতি নির্মাণ করেন।

জনদরদী ও প্রজাহিতৈষী খলিফা হারুন সাধারণ মানুষের অবস্থা স্বচক্ষে অবলোকন করার জন্য রাতে ছদ্মবেশে শহরে পরিভ্রমণ করতেন। তিনি জনসাধারণ, তীর্থযাত্রী ও ব্যবসায়ীদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান করেন। তিনি দশ লক্ষ দীনার ব্যয়ে মক্কা নগরীতে পানি সরবরাহের জন্য "নাহরে যুবাইদা" নামে একটি প্রসিদ্ধ খাল খনন করেন। হিট্টি বলেন, "ফার্দিনান্দ দিলেসেপের এক হাজার বছর আগে হারুন নামে একজন আবর্য খলিফা সুয়েজের অভ্যন্তর দিয়ে একটি খাল খননের পরিকল্পনা করেন।" তিনিই সর্বপ্রথম বাগদাদে হাসপাতাল নির্মাণ করেন।

শিল্প ও বাণিজ্যের পৃষ্ঠপোষকতা ঃ খলিফা হারুনের সময় স্থাপত্য শিল্পের চরম বিকাশ ঘটে। বাগদাদের পণ্য বিশ্ববিখ্যাত ছিল। ব্যবসায় বাণিজ্যের পৃষ্ঠপোষণের ফলে বাগদাদ নগরী ছিল বিশ্বের ধনী ও বণিক শ্রেণীর লোভনীয় স্থান। তিনি ৭৯৪-৯৫ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে কাগজের কল স্থাপন করেন।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা ঃ খলিফা হারুন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। তাঁর আমলে বিশ্ববরেণ্য পণ্ডিত মনীষীগণের মিলনভূমি ছিল বাগদাদ। হিট্টি বলেন, "এই যুগ পৃথিবীর ইতিহাসকে যে কারণে গৌরবোজ্জ্বল করেছে তা হচ্ছে, এ আমলই ইসলামের ইতিহাসের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বাপেক্ষা উৎকর্ষের যুগ। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় মনসুরের প্রতিষ্ঠিত অনুবাদ বিভাগ সম্প্রসারিত হয়। হারুনের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রধান বিচারপতি ইমাম আবু ইউসুফের নেতৃত্বে হানাফী মাযহাব আত্মপ্রকাশ করে। ইমাম বুখারী হাদীস শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। আবু নুয়াস ও আতাইয়া সাহিত্যে এবং আসমায়ী ব্যাকরণে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন।" খলিফার নির্দেশে আর পণ্ডিতগণ গ্রীকসহ প্রভৃতি ভাষার বিজ্ঞান ও দর্শনের গ্রন্থরাজী আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন।

তিনি 'মানকা' নামক ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিদকে বাগদাদে আমন্ত্রণ করেন। সঙ্গীতজ্ঞ ও নৃত্য শিল্পীগণও হারুনের দরবারকে অলংকৃত করত। এ সময়ে রচিত হয় বিখ্যাত আরব্য উপন্যাস। ঐতিহাসিক গীবন বলেন- আরব্যোপন্যাস ব্যতীত- 'রবিনসন ক্রুসো' এবং সম্ভবত গ্যালিভারের ভ্রমণ কাহিনী রচিত হত না।'

হানাফী মাযহাবের পৃষ্ঠপোষকতা ঃ খলিফা হারুনের খিলাফতে হানাফী মাযহাব রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। খলিফার প্রধান কাজী ইমাম আবু ইউসুফ তাঁর শিক্ষক ইমাম আবু হানীফার ফিকাহ শাস্ত্রীয় বিধান ও আইন-কানুনসমূহ লিপিবদ্ধ করে মুসলমানদের শ্রদ্ধার পাত্র হন।

বাগদাদের প্রাচুর্য ঃ খলিফা হারুনের রাজত্বকালে বাগদাদ তদানীন্তন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জাঁকালো ও সমৃদ্ধিশালী নগরীতে পরিণত হয়। সুরম্য রাজপ্রাসাদ, অট্টালিকা, মনোরম সৌধরাজি, সুসজ্জিত হেরেম, নয়নাভিরাম বাগিচা ও ভ্রমণোদ্যানসমূহ বাগদাদকে রূপকথার স্বপ্নপুরীতে পরিণত করেছিল। সে আমলের সমগ্র পৃথিবীতে বাগদাদের সমকক্ষ নগর আর একটি খুঁজে পাওয়া যায় না। বাগদাদের পণ্য ছিল বিশ্ববিখ্যাত। সমুদ্র বন্দর হিসেবে বাগদাদের সুদীর্ঘ পোতাশ্রয় জুড়ে শত শত জাহাজ শোভা পেত। বাগদাদের বাজারসমূহ সমৃদ্ধ থাকত চীনামাটির বাসন-কোসন, তৈজস পত্র, সিল্কের কাপড় ও মুখোশ, ভারত ও মালয়ের মসলা, খনিজ পদার্থ ও রঙ, মধ্য এশিয়ার রুবী, নীলবর্ণের মূল্যবান পাথর, উন্নত বস্ত্র, রাশিয়ার মধু, ভেড়ার লোম, আফ্রিকার হাতির দাঁতে। তাছাড়া দেশ-বিদেশের নানা পণ্য সামগ্রীতে বাগদাদের বাজার ছিল পরিপূর্ণ।

কূটনৈতিক দিক ঃ খলিফা হারুনের সুনাম ও সুখ্যাতি তৎকালীন বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর রাজত্বকালে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু রাজ দরবারের সাথে কূটনৈতিক এবং বন্ধুত্বমূলক যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

ইসলামের তথা তদানীন্তন গোটা বিশ্বের ইতিহাসে খলিফা হারুন-অর-রশীদ ছিলেন এক দীপ্তিমান নক্ষত্র। তাঁর রাজত্বকালে মুসলিম সাম্রাজ্য ঐশ্বর্য ও গৌরবের স্বর্ণশিখরে আরোহণ করে।

চরিত্র

খলিফা হারুন-অর-রশীদ অসামান্য প্রতিভা, অসাধারণ দক্ষতা ও অতুলনীয় চারিত্রিক মাহাত্ম্যের অধিকারী ছিলেন। ঐতিহাসিক উইলিয়াম মূর বলেন, "Harun was perhaps the ablest ruler of the Abaside race. He is liked to Abu Jafar but without his parsimony.

ধর্মভীরুতা ঃ ব্যক্তিগত জীবনে খলিফা ছিলেন ধর্মভীরু, সদাশয় ও দানশীল। তিনি প্রত্যহ নির্ধারিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায ছাড়াও প্রতি রাতে একশত রাকায়াত নফল নামায পড়তেন। তেইশ বছরের শাসনকালে তিনি নয় বার হজব্রত পালন করেন।

কঠোরতা ও কোমলতার সংমিশ্রণ ঃ খলিফা হারুনের চরিত্রে কঠোরতা ও কোমলতার অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল। রাজ্যের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার জন্য যতটুকু কঠোরতার প্রয়োজন ছিল তিনি ততটুকু গ্রহণ করেছিলেন। তিনি অন্যায়কারী ও বিদ্রোহীদের প্রতি যেমন কঠোর ও নির্দয় ছিলেন তেমনি গরিব, দুঃস্থ, অসহায়ের প্রতি সদয় ছিলেন।

সন্দেহপরায়ণতা ঃ তাঁর চরিত্রে বিভিন্ন রাজোচিত গুণাবলীর সমাবেশ থাকা সত্ত্বেও তিনি বংশানুক্রমিক ধৈর্যহীনতা এবং সন্দেহপরায়ণতা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন না। শিয়া ইমাম মূসা আল-কাযিমকে সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কারারুদ্ধ করা এবং পরম বিশ্বস্ত বার্মাকী পরিবারের প্রতি কৃতঘ্ন নিষ্ঠুরতা তাঁর মহানুভব চরিত্রের উপর কলঙ্ক কালিমা লেপন করেছে। সৈয়দ আমীর আলী বলেন, "হারুন অর রশীদের চরিত্রের প্রধান দোষ ছিল তাঁর আকস্মিক সন্দেহপরায়ণতা, অযথা ধৈর্যহীনতা।"

ঐতিহাসিক উইলিয়াম মূর বলেন, আব্বাসীয় গোষ্ঠীর মধ্যে সম্ভবত হারুনই সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন। আবু জাফরের চরিত্রের নিষ্ঠুরতার দিকটি বাদ দিলে শুধু তাকেই হারুনের সাথে তুলনা করা যায়।

ইতিহাসে হারুনের স্থান

ঐতিহাসিক সমালোচনার মানদণ্ডে পরিমাপ করলে আমরা দেখতে পাই যে, চরিত্র-মাহাত্ম্য ও শাসন-কুশলতায় হারুন-অর-রশীদ ছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শাসকদের অন্যতম। ঐতিহাসিক গীবন তাঁকে আব্বাসীয় বংশের সর্বাপেক্ষা প্রতিভাবান খলিফা বলে আখ্যায়িত করেছেন। খলিফা হারুনের গৌরবদীপ্ত কীর্তিকলাপ Arabian Nights বা আরব্যোপন্যাস-এর রোমাঞ্চকর কাহিনীগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

খলিফা হারুনের শাসনকালকে ঐতিহাসিক উইলিয়াম মূরের ভাষায় মন্তব্য করা যায় যে, হারুনের পূর্বে অথবা পরে কোন খলিফাই বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যে– তা ধর্ম পালনেই হোক বা শাসন পরিচালনায়ই হোক অথবা সমর ক্ষেত্রেই হোক তাঁর ন্যায় এত কর্মতৎপরতা ও উদ্যমশীলতা প্রদর্শন করতে পারেননি।

হিট্টি বলেন, "নবম শতাব্দীর প্রথম দিকে বিশ্বপরিক্রমার দু'জন নৃপতি ভাস্বর হয়ে আছেন– পাশ্চাত্যের শার্লিমেন এবং প্রাচ্যে হারুন। উভয়ের মধ্যে নিঃসন্দেহে হারুন অধিকতর ক্ষমতাশালী ও সংস্কৃতিবান ছিলেন।" সুতরাং সত্যিই হারুন-অর-রশীদ ছিলেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতিদের অন্যতম মহান নৃপতি।

সার-সংক্ষেপ

আব্বাসীয় খলিফা হারুন-অর-রশিদ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তৎকালীন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নরপতিদের অন্যতম। তাঁর রাজত্বকালকে ইসলামের ইতিহাসের স্বর্ণযুগ বলা হয়। তাঁর আমলে মুসলিম সাম্রাজ্য ঐশ্বর্য ও শিল্প গৌরবের স্বর্ণশিখরে আরোহন করে। খলিফা হারুন-অর-রশিদ অসামান্য প্রতিভা, অসাধারণ দক্ষতা ও অতুলনীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। শাসন পরিচালনায় তাঁর কৃতিত্ব নানা দিক দিয়ে এজন্যই তিনি ইতিহাসে এত বিখ্যাত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৯.৬

অল্প কথায় উত্তর দিন।

১. হারুন-অর-রশিদ কত বছর আব্বাসীয় খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন?
২. তাঁর শাসন পরিচালনায় কোন পরিবারের সহযোগিতা ছিল?
৩. মক্কা নগরীতে পানি সরবরাহের জন্য কত দিনের খরচ করে কোন খাল খনন করেন?
৪. কত বছর আজো লোন খলিফা সুয়েজের অভ্যন্তরে খাল খননের পরিকল্পনা করেন?
৫. কত সালে বাগদাদে কে কাগজ কল স্থাপন করেন।
৬. 'হারুন-রশিদের চরিত্র ছিল কঠোরতা ও কোমলতার সংমিশ্রণ ব্যাখ্যা করুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. হারুন-অর-রশিদের কৃতিত্বের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো তুলে ধরুন।
২. খলিফা হারুন-অর-রশিদের চরিত্র বিশ্লেষণ করুন।

পাঠ ৭ বার্মাকীদের উত্থান-পতন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- বার্মাকীদের পরিচয় বর্ণনা করতে পারবেন
- বার্মাকী বংশের উত্থান সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন
- বার্মাকীদের পতনের কারণ বর্ণনা করতে পারবেন
- আব্বাসীয় খিলাফতে বার্মাকীদের অবদান মূল্যায়ন করতে পারবেন।

প্রাথমিক যুগের আব্বাসীয় খলিফাগণের বিশেষ করে খলিফা হারুন-অর-রশীদ (৭৮৬-৮০৯ খ্রি.)-এর শাসন গৌরবের মূলে রয়েছে বার্মাকী পরিবারের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অপূর্ব কর্মকুশলতা। দীর্ঘদিন ধরে অবিচলিত আনুগত্যের সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম করে রশীদের রাজত্বকে গৌরবোজ্জ্বল এবং শ্রী-সম্পদে ভরপুর করে তোলে বার্মাকীগণ। তারা মঙ্গলজনক কার্যাবলীর দ্বারা জনগণের আস্থাভাজন হয়েছিল।

বার্মাকীদের পরিচয়

বার্মাকী নামক জনৈক লোক বলখের বৌদ্ধ মঠের পুরোহিত ছিলেন। খলিফা ওয়ালিদের রাজত্বকালে সেনাপতি কুতাইবা মধ্য এশিয়া অভিযান পরিচালনার সময় বার্মাকের পত্নীকে বন্দী করে দামেস্কে নিয়ে আসেন। সেখানে খালিদ জন্মগ্রহণ করেন এবং বয়োপ্রাপ্ত হলে ইসলাম গ্রহণ করেন। উমাইয়াদের বিরুদ্ধে আব্বাসীয় বিপ্লবের সময় খালিদ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর খালিদ বিন বার্মাকী খলিফা আস্‌সাফফাহর উপদেষ্টা, মনসুরের রাজত্বকালে মন্ত্রী, পরে তাবারিস্তানের রাজ্যপাল এবং বাইজান্টাইনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। খালিদের পুত্র ইয়াহিয়াকে মনসুর প্রথম আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের শাসনকর্তা এবং পরে মাহদী তাঁকে হারুনের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। ইয়াহিয়ার চার পুত্র ফজল, জাফর, মূসা ও মুহাম্মদ উচ্চ পর্যায়ের শাসন যোগ্যতাসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন।

বার্মাকী বংশের উত্থান

বার্মাকী বংশের উত্থানের পর্যায়ক্রমে বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

ক. বার্মাকী বংশের প্রতিষ্ঠাতা ঃ খালিদ বিন বার্মাকী আব্বাসীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি বার্মাকী আব্বাসীয় খিলাফতের প্রারম্ভেই স্বীয় কর্মদক্ষতা ও রণ কুশলতার জন্য যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তি অর্জন করেন। খালিদ আব্বাসীয় খিলাফতের সময় যে সকল গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন তা হল-

রাজস্ব বিভাগের প্রধান কোষাধ্যক্ষ ঃ আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ আবুল আব্বাস (৭৫০-৮৫৪ খ্রি.) তাকে রাজস্ব বিভাগের প্রধান কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ করেন। খলিফা মনসুরের সময়ও তিনি উক্ত পদে বহাল ছিলেন।

তাবারিস্তানের শাসনকর্তা ঃ তাঁর অসামান্য সাংগঠনিক দক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে আল মনসুর (৭৫৪-৭৭৫ খ্রি.) তাকে ৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে শিয়াদের বিদ্রোহ দমনের জন্য তাবারিস্তানের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। তিনি সমূলে একটি উপজাতীয় বিদ্রোহ দমন করে কৃতিত্ব অর্জন করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি শাসনকর্তার পদে বহাল ছিলেন।

উপদেষ্টা ঃ তিনি উজীর নামে প্রতিষ্ঠিত না হলেও খলিফা আল মনসুর আল মাহদীর আমলে উপদেষ্টার মর্যাদা লাভ করেন।

খ. ইয়াহিয়া ঃ খলিফা মাহদী ইয়াহিয়াকে কারারুদ্ধ করেন, হারুন-অর-রশীদ খিলাফত লাভ করে ইয়াহিয়াকে মুক্তি দেন এবং প্রধান উজীর পদে নিয়োগ করেন।

গ. ফজল বিন ইয়াহিয়া ঃ ইয়াহিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র ফজল হারুনের বাল্য সাথী ছিলেন এবং হারুন তাঁকে পরম স্নেহে ভাই বলে সম্বোধন করতেন। ফজল ৭৯১ খ্রিস্টাব্দে খোরাসানের শাসনকর্তা ইয়াহিয়া বিন আব্দুল্লাহকে পরাজিত করেন। অতঃপর তিনি মিশরের শাসনকর্তা হিসেবে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। পিতা ইয়াহিয়া বার্ধক্যের কারণে অবসর গ্রহণ করলে তিনি প্রধানমন্ত্রী বা উজীরের পদ অলঙ্কৃত করেন।

ঘ. জাফর বিন ইয়াহিয়া ঃ ভ্রাতা ফজলের পর জাফরও প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন।

ঙ. মূসা ও মুহাম্মদ ঃ বার্মাকী বংশের অপর দুজন মূসা ও মুহাম্মদ হারুন-অর-রশীদের রাজত্বে বিভিন্ন প্রদেশে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত থেকে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের সংহতি ও সমৃদ্ধিকে সুদূর প্রসারী করেন।

বার্মাকীদের পতন

যে বার্মাকীগণ দীর্ঘ সতের বছর ধরে অবিচলিত আনুগত্যের সাথে কঠোর পরিশ্রম করে হারুনের রাজত্বকে গৌরবোজ্জ্বল এবং শ্রী-সম্পদে ভরপুর করে তোলে। যে বার্মাকীগণ মঙ্গলজনক কার্যাবলীর দ্বারা সাম্রাজ্যের জনগণের মনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ৮০৩ খ্রিস্টাব্দে তাদের আকস্মিক পতন ইতিহাসের একটি বিস্ময়কর ঘটনা। বার্মাকী বংশের পতনের কারণগুলো নিম্নে দেয়া হল ঃ

সুখ্যাতি ও ধনরত্ন ঃ ঐতিহাসিক ইবনে খালদুনের মতে, তাদের সুখ্যাতি ও অগণিত ধন-রত্ন তাদের পতনের অন্যতম কারণ। প্রয়োজনের সময় স্বয়ং খলিফাকেও বার্মাকীদের মুখাপেক্ষী হতে হত।

প্রভাব ও জনপ্রিয়তা ঃ হারুন-অর-রশীদের ন্যায় স্বেচ্ছাচারী ও দৃঢ়চেতা খলিফার নিকট তাঁদের অত্যধিক প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং অপরিসীম জনপ্রিয়তা অসহ্য হয়ে ওঠে। তিনি তাদের পতন ঘটানোর জন্য অধীর হয়ে ওঠেন।

খলিফার ভগ্নির সাথে বিবাহ ঃ কোন কোন ঐতিহাসিকে মতে, হারুন অর-রশীদের ভগ্নি আব্বাসার সঙ্গে জাফর ইবন ইয়াহিয়ার গোপন বিবাহই বার্মাকীদের পতনের একমাত্র কারণ।

উচ্চপদস্থ সভাসদদের মনে হিংসা ঃ তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি, সম্মান ও মর্যাদাতে শুধু খলিফাই নন সভাসদগণ ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের মনে হিংসার উদ্রেক হয়।

আরবি ও পারসিক আমীরদের দ্বন্দ্ব ঃ সাম্রাজ্যের শাসন সংক্রান্ত প্রাধান্য নিয়ে আরব আমীর এবং পারসিক আমীরগণের মধ্যে বহুকাল ধরে দ্বন্দ্ব চলছিল। পারসিক বার্মাকীদের প্রতি খলিফার গভীর বিশ্বাস ও অনুরাগকে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করতে না পারলে আরব আমীরদের স্বার্থ সিদ্ধি হবে না। তাই তারা পারসিক আমীরদের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তাদের এই জঘন্য কর্মসূচি বার্মাকী বংশের পতনের অন্যতম কারণ।

শিয়া ও সুন্নী দ্বন্দ্ব ঃ বার্মাকীগণ ছিল শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। আব্বাসীয় খলিফাগণ এবং আরব আমীরগণ ছিলেন সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত। কাজেই শিয়াদের প্রাধান্য সুন্নী মুসলমানগণ কোনভাবেই গ্রহণ করতে পারছিল না।

ফজল বিন রবির ব্যক্তিগত শত্রুতা ঃ হারুনের গৃহাধ্যক্ষ ফজল বিন রাবি ব্যক্তিগতভাবে বার্মাকীদের ঘোরতর শত্রু ছিলেন। আব্বাসীয় খিলাফতের প্রধান উজীর হওয়ার আশায় তিনি বার্মাকীদের সর্বনাশের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

আলী বংশীয়দের সাথে ঘনিষ্ঠ মেলামেশা ঃ ঐতিহাসিক জুরজি জায়দানের মতে, বার্মাকীগণ আলী বংশীয় লোকদের সাথে গোপনে মিলিত হয়ে বৈঠক করতেন। এই সংবাদ ফজল বিন রাবির নিকট হতে খলিফা অবগত হয়ে নিজের পদচ্যুতির আশঙ্কা করেন। এতে খলিফা হারুন একেবারে অধৈর্য হয়ে ওঠেন এবং বার্মাকীদের ধ্বংস সাধন করেন।

আব্বাসীয় খিলাফতে বার্মাকীদের খিদমত

আব্বাসীয় খিলাফতে বার্মাকীদের অবদান ছিল অবিস্মরণীয়। যেমন-

১. রাজনৈতিক অবদান ঃ উমাইয়াদের পতন ঘটিয়ে আব্বাসীয়দের উত্থানে খালিদের দান অনন্য। খালিদ বিভিন্ন সময় সেনাবাহিনীতে সেনাপতি এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি আব্বাসীয় খিলাফতের প্রথম উজীর ছিলেন। ইয়াহিয়া অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন উজীর হিসেবে খলিফা হারুনের মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেন। ইয়াহিয়া বৃদ্ধ হয়ে গেলে তার পুত্র জাফর বার্মাকী এই পদ অলংকৃত করেন। তার পরে অপর তিন পুত্র। ফজল সিরিয়ার শাসনকর্তা, মূসা ও মুহাম্মাদ রাজ্যের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদে সমাসীন ছিলেন।

শাসনতান্ত্রিক অবদান ঃ আব্বাসীয় খিলাফতে তারাই সর্বপ্রথম একনায়কত্বকে জোরদার করেন। উজীরের পদ সৃষ্টি করে তারাই এই পদে প্রথম অধিষ্ঠিত হন। তখন হতে অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন উজীর পদের সৃষ্টি হয়। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় মসজিদ, খাল এবং অন্যান্য জনহিতকর কার্য সাম্রাজ্যব্যাপী বিস্তার লাভ করে।

আদব-কায়দা ঃ এই পারসিক উজীর পরিবারের প্রতিনিধিত্বে পারসিক আদব-কায়দা, হাল-চাল সাম্রাজ্যের সর্বত্র প্রাধান্য লাভ করে। তারা রাজনীতির পথ প্রদর্শক ছিলেন। তাদের প্রভাব জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিফলিত হয়।

কৃষ্টি ও সভ্যতায় অবদান ঃ কৃষ্টি ও সভ্যতার ক্ষেত্রে তাদের দান অনন্য। হিট্টি বলেন, ওদের প্রভাবে, হিন্দুস্তান, পারস্য, মিশর প্রভৃতি দেশ হতে আগত বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকগণ বিশেষভাবে সমাদৃত হতেন। প্রখ্যাত মন্ত্রী খালিদের তত্ত্বাবধানে পারসিক জ্যোতির্বিজ্ঞানী নওবখত এবং মাল্লাহ নামক এক ইহুদী পণ্ডিত বাগদাদ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন।

সার-সংক্ষেপ

বার্মাকী বংশ আব্বাসীয় খিলাফতের শ্রী বৃদ্ধিতে অশেষ অবদান রাখেন। তাঁদের ছোঁয়ায় আব্বাসীয় খিলাফত সভ্যতার স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হয়। কিন্তু ইতিহাসের নির্মম পরিহাস তাঁদের এই প্রভাব অন্যদের চক্ষুশূলে পরিণত হয়। তাঁদের যোগ্যতা অচিরেই তাদের পতন ডেকে আনে। বার্মাকীদের পতনের ঘটনা শুধু হারুনের রাজত্বকালের উজ্জ্বলতাকেই ম্লান করেনি, বরং তার ভবিষ্যত জীবনকেও অনুশোচনা ও কৃতঘ্নতাজনিত বিবেকানুভূতি দ্বারা সমাচ্ছন্ন করে রেখেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৯.৭

শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

১. বার্মাকী নামক জনৈক লোক বলখের .... পুরোহিত ছিলেন।
২. খলিফা ওয়ালিদের রাজত্বকালে সেনাপতি কুতাইবা মধ্য এশিয়ায় অভিযান পরিচালনার সময় বার্মাকের ..... বন্দী করে দামেস্কে নিয়ে আসেন।
৩. সেখানে ..... জন্মগ্রহণ করেন এবং বাযেপ্রাপ্ত হলে ..... গ্রহণ করেন।
৪. উমাইয়াদের বিরুদ্ধে ..... বিপ্লবের সময় খালিদ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।
৫. আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর খালিদ বিন বার্মাকীকে খলিফা আস্‌সাফফার উপদেষ্টা ও মনসুরের রাজত্বকালে ....., পরে তাবারিস্তানের ..... এবং বাইজান্টাইনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ..... পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।
৬. খালিদের পুত্র ইয়াহিয়াকে মনসুর প্রথম আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের ..... এবং পরে মাহদী তাঁকে ..... গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন।
৭. ইয়াহিয়ার চারপুত্র ফজল, ..., মূসা ও ..... উচ্চ পর্যায়ের শাসন যোগ্যতা সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. বার্মাকীদের পরিচয় দিন।
২. বার্মাকী বংশের উত্থান সম্বন্ধে বিবরণ দিন।
৩. আব্বাসীয় খিলাফতে বার্মাকীদের অবদান মূল্যায়ন করুন।
৪. বার্মাকীদের পতনের কারণ বিশ্লেষণ করুন।

পাঠ ৮ আমীন ও মামুনের মধ্যে গৃহযুদ্ধ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- খলিফা আমীন ও মামুনের মধ্যে সংঘটিত গৃহযুদ্ধের কারণগুলো বলতে পারবেন
- গৃহযুদ্ধের ঘটনা ও ফলাফল বর্ণনা করতে পারবেন
- মামুনের সাফল্যের কারণ বলতে পারবেন।

প্রারম্ভিক কথা

হারুন-অর-রশিদের ১২ জন পুত্র ছিলেন। এঁদের মধ্যে মুহম্মদ আল-আমীন ছিলেন তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী বেগম যুবাইদার সন্তান। উত্তরাধিকারের প্রশ্নে ভবিষ্যতে যাতে কোনরকম গোলযোগ সৃষ্টি না হয় এজন্য হারুন পুত্রদের মধ্যে চারজনকে পরপর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র আল-আমীন সম্ভ্রান্ত মায়ের সন্তান বলে তাঁকে প্রথম মনোনয়ন দান করেন। পারসিক মায়ের গর্ভজাত পুত্র আবদুল্লাহ আল মামুনকে তিনি দ্বিতীয় উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কাসিম আল-মুতামিনকে তৃতীয় এবং আবু ইসহাক মুহাম্মদ-মুতাসিমকে চতুর্থ উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনয়ন দান করা হয়। তাছাড়া আরও স্পষ্ট করে ভাগ করে দেওয়ায় হয় যে আল-আমীন বাগদাদে খলিফা হবেন, মামুন খোরাসানের শাসনকর্তা থাকবেন এবং ছোটভাইয়ের আনুগত্য মেনে চলবেন। তেমনিভাবে কাসিম আল-মুতামিনকে আওয়াসীন প্রদেশের শাসনকর্তার দায়িত্ব দেওয়া হয়। হারুন-অর-রশিদ তাঁর ব্যবস্থা যাতে সুষ্ঠুভাবে অনুসরণ করা হয় সেজন্য আমিন ও মামুনকে মক্কা শরীফ নিয়ে একটি চুক্তিপত্র করে দেন।

খলিফা হারুনের মৃত্যুর পর তাঁর অসিয়ত মোতাবেক ৮০৯ খ্রিস্টাব্দে আল-আমিন বাগদাদের সিংহাসনে বসেন এবং মামুন খোরাসানের শাসনকর্তা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কাসিমও আওয়াসীম এলাকার শাসনকার্য চালাতে থাকেন। প্রথম পর্যায়ে ভাইদের মধ্যে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। কিন্তু নানা কারণে পরবর্তীতে সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং গৃহযুদ্ধের রূপ নেয়।

আমীন ও মামুনের মধ্যে গৃহযুদ্ধ

আল-আমীনের শাসন কাল ৮০৯-৮১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অনেকটা গৃহযুদ্ধের মধ্যে অতিবাহিত হয়। আমীন ও মামুনের এই দ্বন্দ্ব আব্বাসীয় খিলাফতের কলঙ্কজনক অধ্যায় এবং এর ফলে আব্বাসীয় খিলাফতের চরম ক্ষতি সাধিত হয়। এ ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের অনেকগুলো কারণ রয়েছে, যার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারণ হল নিম্নরূপঃ

গৃহযুদ্ধের কারণ

আমীন কর্তৃক মামুনের সেনাবাহিনী ও ধনাগার আত্মসাৎ ঃ মৃত্যুকালে খলিফা হারুন যার যা অধিকারে আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে অছিয়ত করে যান। সেই অছিয়ত অনুসারে আমীন বাগদাদের, মামুন খোরাসানের এবং কাসিম কিন্নিসীর প্রদেশের অর্থভাণ্ডার ও সেনাবাহিনীর অধিকারী হন। ৮০৯ খ্রি. খলিফা হারুন খোরাসানে বিদ্রোহ দমনে যান, পথিমধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর সঙ্গের ধনাগার ও সেনাবাহিনী মামুনের নামে উইল করেন। পিতার সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তি মানার ইচ্ছা আমীনের ছিল না তিনি গুপ্তচর এবং ফজল বিন রবীকে পাঠিয়ে উক্ত বাহিনীকে বাগদাদে ফিরিয়ে আনেন। আমীনের এই অন্যায় আচরণে মামুন তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠেন।

আরবীয় ও পারসিক আমীরদের দ্বন্দ্ব ঃ আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবার পর হতেই আরবীয় ও পারসিক আমীরদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতা শুরু হয়। আমীনের মাতা, তাঁর সমর্থকগণ ও অমাত্যবর্গ সকলেই খাঁটি আরব ছিলেন। পক্ষান্তরে মামুনের মাতা পারসিক মহিলা ছিলেন। তাঁর সমর্থক ও পরামর্শ দাতা সকলেই ছিলেন পারসিক। স্বার্থপর আরব আমীর ও পারসিক আমীরদের বিদ্যমান দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠেছিল।

আমীনের ঈর্ষা ঃ মামুনের উদার ব্যবহারে তিনি নেতৃস্থানীয় লোকদের সমর্থন লাভে সমর্থ হন। রাজকর মওকুফ করে এবং আরও অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করে মামুন প্রাচ্যের দেশসমূহে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তারা তাদের ভগ্নির পুত্র হিসেবে মামুনের চারদিকে সংঘবদ্ধ হয়। মামুনের সুখ্যাতি ও জনপ্রিয়তায় আমীনের মনে ঈর্ষার উদ্রেক হয়।

আমীনের আমোদ প্রিয়তা ও রাজকর্মে অবহেলা ঃ যে সময় মামুন তাঁর অধীনস্থ প্রদেশে শাসন শৃংখলা সম্পাদনে ব্যস্ত ছিলেন, তখন অদূরদর্শী খলিফা আমীন রাজ্যের শাসনভার ফজল বিন রবীর হাতে ছেড়ে দিয়ে আমোদ-প্রমোদ বিলাস-ব্যসনে মত্ত থাকেন। শীঘ্রই তাঁর দরবার নর্তকী ও গায়িকাদের আবাস স্থলে পরিণত হয়।

আমীনের কুশাসন ঃ তিনি রাজকার্য উপেক্ষা করে আমোদ-প্রমোদে সম্পদ অপব্যয় করে রাজকোষ প্রায় শূন্য করে ফেলেন। আমীন ও তাঁর উজীর ফজল বিন রাবীর এরূপ কুশাসনের ফলে সাম্রাজ্য ধ্বংসের মুখে ধাবিত হচ্ছিল। জনসাধারণ তাঁদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং শীঘ্রই তাঁদের হাত হতে মুক্তি কামনা করছিল।

ফজল বিন রবীর স্বার্থপরতা ও খেলাফতের দুরাশা ঃ ফজল বিন রবী অযোগ্য হলেও উচ্চাভিলাষী ছিলেন। তিনি আমীনের চারিত্রিক দুর্বলতা অবগত হয়ে নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমীনের পক্ষ সমর্থন করেন। মামুনের মত শক্তিশালী শাসক খেলাফতের সিংহাসনে আরোহন করলে তার স্বার্থসিদ্ধির পথ চিরতরে বন্ধ হবে ভেবে মামুনকে ধ্বংস করাই তার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়।

মামুনকে প্রাচ্যের এবং কাসিমকে মেসোপটেমিয়ার শাসনকর্তা পদ হতে বরখাস্ত ঃ আমীন তার জনৈক সভাসদের কুমন্ত্রণায় পড়ে মামুনকে প্রাচ্যের এবং অপর ভ্রাতা কাসিমকে মেসোপটেমিয়ার শাসনকর্তার পদ হতে বরখাস্ত করেন। খোতবায় তাঁদের নাম পাঠ না করার নির্দেশ দেন।

আমীন কর্তৃক চুক্তি পত্রের শর্তভঙ্গ ঃ ৮১১ খ্রি. আমীন মামুনের স্থলে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মূসাকে নাতিক বিল হক উপাধি দিয়ে উত্তরাধিকার মনোনিত করেন। কিছুদিন পর তাঁর দ্বিতীয় পুত্রকেও তৎপরবর্তী উত্তরাধিকার মনোনয়ন করেন। কা'বাগৃহে তাঁর পিতার রক্ষিত যে মনোনয়ন পত্র ছিল সেগুলো এনে টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে ফেলেন।

মামুনের পুত্রদ্বয়কে হত্যার পরামর্শ ঃ দুষ্ট ফজল বিন রাবী মামুনের দুই পুত্রকে হত্যা করার জন্য খলিফা আমীনকে পরামর্শ দেয়।

মামুনের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ ঃ খলিফা আমীন ফজল বিন রবীর পরামর্শে মামুনকে দেয়া ১,০০,০০০ দিরহাম এবং তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন।

গৃহযুদ্ধের ঘটনাবলী ও ফলাফল

সীমান্ত বন্ধ ঃ অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরে মামুন তাঁর রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে প্রহরী মোতায়েন করেন। বিনা অনুসন্ধানে যেন তার এলাকায় কাউকেও প্রবেশ করতে দেয়া না হয় সেজন্য কড়া নির্দেশ দেন। খলিফা আমীনের কোন গুপ্তচর কিংবা পত্র খোরাসানে প্রবেশ করতে পারল না। ফলে ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে সংঘর্ষ আরম্ভ হল।

আমীনের সেনাবাহিনীর পরপর পরাজয় ঃ আমীন আলী ইবনে ঈসার নেতৃত্বে ৫০,০০০ সৈন্যের একটি দল পাঠান। আমীনের সৈন্যবাহিনী ৮১১ খ্রিস্টাব্দে রাবী নামক স্থানে সংঘটিত যুদ্ধে মামুনের সেনাপতি তাহির ইবনে হুসাইনের নিকট পরাজিত হয়। যুদ্ধে আলী ইবনে ঈসা নিহত হন। এই দুঃসংবাদ শুনে আমীন সেনাপতি আঃ রহমানের নেতৃত্বে তাহিরের বিরুদ্ধে আর একটি সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। এই দলটিও শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়।

মামুনের খলিফা উপাধি গ্রহণ ঃ এর পর মামুন খলিফা উপাধি গ্রহণ করেন। আরও কয়েক বার মামুনের বিরুদ্ধে আমীনের প্রেরিত সেনাবাহিনী তাহিরের নিকট পরাজিত হয়। তাহির ও হারসামা সমগ্র আরব ও ইরাক মামুনের অধীনে আনয়ন করেন।

বাগদাদ অবরোধ ঃ এরপর মামুনের সেনাপতিত্রয় তাহির, হারসামা ও জুহাইর একত্রে বাগদাদ অবরোধ করেন। এমতাবস্থায় বাগদাদে অবস্থান নিরাপদ নয়। ভেবে আমীন তাঁর মাতা ও পরিবারবর্গসহ দজলার পশ্চিম তীরে অবস্থিত মদীনাতুল মনসুর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

আমীনের আত্মসমর্পণ ঃ অবশেষে বাধ্য হয়ে খলিফা আমীন বিশ্বস্ত সেনাপতি হারসামার নিকট আত্মসমর্পণ করেন। কিন্তু রাতের অন্ধকারে কয়েকজন উগ্রপন্থী পারসিক কর্তৃক হতভাগ্য আমীন নিহত হন। এই মর্মান্তিক সংবাদ পেয়ে মামুন শোকে অভিভূত হয়ে পড়েন। তিনি হত্যাকারীদের তাৎক্ষণিক শাস্তির বিধান করেন। এভাবে আমীন ও মামুনের মধ্যে সংঘটিত ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। আমীন চার বছর আট মাস রাজ্য শাসন করেন।

আমীনের বিরুদ্ধে মামুনের সফলতার কারণ

মাওয়ালী শক্তির প্রাধান্য ঃ আমীন-মামুনের মধ্যকার ভ্রাতৃ সংগ্রাম মূলত আরবীয় ও পারসিক মাওয়ালীদের মধ্যকার সংগ্রাম। আব্বাসীয় যুগের সূচনা হতে আরবীয় প্রাধান্য লোপ পেতে থাকে এবং মাওয়ালী আধিপত্য বিস্তৃত হতে থাকে। পারসিকরা মামুনকে তাদের ভগ্নির পুত্র হিসেবে মনে প্রাণে সাহায্য করেছিল।

পারসিকগণের শ্রেষ্ঠত্ব ঃ পারসিকগণ আরবদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত যোগ্যতর এবং কৌশলী ছিলেন। কাজেই ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে মামুন সহজেই জয়লাভে সক্ষম হয়েছিলেন।

জনসমর্থনের অভাব ঃ চারিত্রিক দুর্বলতার জন্য আমীনের পেছনে জনসমর্থন কম ছিল। অন্যদিকে মামুনের চারিত্রিক মাধুর্য জনগণকে তাঁর দিকে আকৃষ্ট করেছিল।

আমীনের পরামর্শদাতাদের অযোগ্যতা ঃ আমীনের উজীর ফজল ইবনে রাবীর অপরিণামদর্শিতা এবং দুষ্কর্ম আমীনের পরাজয়ের মূল কারণ ছিল। আলী ইবনে ঈসার দুর্বল সেনাপতিত্ব আমীনের পতন ঘটায়।

অস্তিত্বের প্রশ্ন ঃ আমীনের বিরুদ্ধে মামুনের সংগ্রাম মামুনের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম। যখন মামুনের সেনাপতি মামুনের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আদাজল খেয়ে কাজ করছিল তখন আমীন ও ফজল মামুনের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ইত্যাদি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিল।

অন্যায়ের উপর ন্যায়ের জয় ঃ আমীন ক্ষমতা লাভের জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল, আর মামুন স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য লড়াই করেছিল। কাজেই পরিশেষে মামুনই বিজয় লাভ করল। মামুনের জয় ও আমীনের পরাজয় ছিল অন্যায়ের উপর ন্যায়ের জয়।

খলিফা আমীন রাজ্যের সর্বস্ব অমাত্যবর্গের হাতে ছেড়ে নর্তকী ও মদ্যপানের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে চরম অবহেলা ও অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। আর মামুন তাঁর উদারতা ও জনপ্রিয়তার সদ্ব্যবহার করে যথাযথ কাজই করেছেন। আমীন তাঁর ভ্রাতা হলেও তাঁর প্রতি অস্ত্র ধারণ করে তিনি ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যায়ের উপর ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এমনই কঠিন বাস্তবতা।

সার-সংক্ষেপ

খলিফা হারুন-অর-রশীদের বারজন পুত্র ছিলেন। উত্তরাধিকার নিয়ে গণ্ডগোলের আশংকায় তিনি জীবিত থাকাকালে চারপুত্রের মধ্যে উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করেন। তাঁর নির্দেশ মত প্রথমে বাগদাদের খলিফা হন দ্বিতীয় পুত্র আল-আমিন আর খোরাসানের শাসনকর্তা হন প্রথম পুত্র মামুন। প্রথমে মামুন ছোট ভাইয়ের আনুগত্য স্বীকার করেন। তাঁদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ও ছিল। কিন্তু অপেক্ষাকৃত অযোগ্য আল-আমীন আমোদ-প্রমোদে মত্ত হয় আমত্যবর্গের কাছে ক্ষমতা ছেড়ে দেন। আমত্যদের কারণে সৎ ভাই মামুনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হয়। বিলাস-ব্যাসনে মত্ত আল আমীন তাদের চক্রান্তে পড়ে মামুনের বিরুদ্ধে এমন অনেকগুলো ব্যবস্থা গ্রহণ করে যে মামুনকে বাধ্য হয়ে আমীনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে হয়। আর মামুনের যোগ্যতার কাছে আল-আমীনের পরাজয় ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৯.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিকা দিন-

১. খলিফা হারুন-অর-রশীদের পুত্র ছিল-
   ক. চারজন খ. বারজন গ. তিনজন ঘ. দুইজন।
২. বেগম যুবাইদার সন্তান ছিলেন-
   ক. আল-মামুন খ. আল-মুতামিন গ. আল-মুতাসিম ঘ. আল-আমিন।
৩. খলিফা হারুনের যে উত্তরাধিকারী ৮০৯ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদের সিংহাসনে বসেন তিনি হচ্ছেন-
   ক. আল-মুতাসিম খ. আল-আমিন গ. আল-মামুন ঘ. আল-মুতাসিন
৪. ফজল বিন রাবীর উদ্দেশ্য ছিল-
   ক. আল-মামুনকে ধ্বংস করা খ. নিজের ক্ষমতা দখল
   গ. আল-আমিনকে ক্ষমতায় রাখা ঘ. মামুনকে ক্ষমতায় আনা।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. হারুন-অর-রশীদ কেন কিভাবে উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করে যান।
২. আমিন ও মামুনের মধ্যে গৃহযুদ্ধের কারণ নির্দেশ করুন।
৩. গৃহযুদ্ধের ঘটনা ও ফলাফল লিখুন।
৪. মামুনের সফল্যের কারণ বিশ্লেষণ করুন।

পাঠ ৯ আল-মামুন (৮১৩-৮৩৩ খ্রি.)-এর শাসনামলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আল মামুনকে মূল্যায়ন করতে পারবেন
- জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়ন সাধনে মামুন-এর গৃহীত কার্যাবলীর বর্ণনা দিতে পারবেন।

খলিফা হারুন-অর-রশীদের মনোনয়নের ত্রুটির কারণে আমীন ও মামুন দুই ভাইয়ের মধ্যে বাগদাদের আব্বাসীয় খিলাফত নিয়ে সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে পারসিকদের সমর্থন নিয়ে মামুন জয়লাভ করেন। তিনি ৮১৩ থেকে ৮৩৩ খ্রিঃ পর্যন্ত বাগদাদের খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সিংহাসনে আরোহন করে সাম্রাজ্যের সকল বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলা দমন, নিরবচ্ছিন্ন সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তবে তিনি একজন শাসক অপেক্ষা জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে অধিক সফল ছিলেন। তিনি ছিলেন আব্বাসীয় বংশের এমন কি সমগ্র মুসলিম বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ বিদ্যোৎসাহী নরপতি। ঐতিহাসিক আমীর আলীর মতে, "Mamun's reign was unquestionably the most brilliant and glorious of all in the history of Islam." অর্থাৎ "মামুনের রাজত্বকাল সন্দেহাতীতরূপে ইসলামের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল ও গৌরবময় যুগ। তাঁর সময় শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার প্রভূত উৎকর্ষ সাধিত হয়।"

জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় মামুন

কোন শাসকের কৃতিত্ব মূল্যায়নের মানদণ্ড যদি জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধন হয়, তাহলে আল-মামুন শুধু আরব ইতিহাসে নয়, বরং তাঁকে সমগ্র বিশ্বের নরপতিদের পর্যায়ভুক্ত অবশ্যই করতে হবে। আব্বাসীয় যুগ ছিল জ্ঞানচর্চা, বিকাশ এবং বিশ্বে ইসলামকে আন্তর্জাতিকীকরণের যুগ। এই প্রক্রিয়ার অগ্রনায়ক ছিলেন মামুন। তিনি নিজেও ধর্ম, দর্শন, তর্ক, আইনশাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁর উদার মনোভাবের কারণে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বিখ্যাত পণ্ডিতগণ তাঁর দরবার অলংকৃত করেন। এই বিখ্যাত পণ্ডিতগণ ইতিহাস, দর্শন, ধর্ম, আইন ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার ওপর গবেষণা, পর্যালোচনা করে দিবারাত কাটাতেন।

শিক্ষা প্রসারে ভূমিকা ঃ তিনি শিক্ষা বিস্তারের জন্য সাম্রাজ্যে অসংখ্য মাদ্রাসা, স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করেন এবং লাখেরাজ সম্পত্তিও দান করেন মামুন বুঝতে পেরেছিলেন যথার্থ শিক্ষা ও সংস্কৃতির চর্চার মধ্যেই দেশ ও জাতির কল্যাণ নিহিত। এজন্য তিনি সকল-কাজেই মাদ্রাসা-মসজিদকে ব্যাপকভাবে স্থায়ী আয়ের আওতা নিয়ে আসেন। তিনি চীন দেশের অনুকরণে কাগজের কল স্থাপন করেন। ঐতিহাসিক ওয়েল হাউসেনের মতে, "We see for first time, perhaps in the history of the world, a religious and in its triumphs."

অনুবাদের ক্ষেত্রে মামুনের অবদান ঃ খলিফা মনসুরের সময় বিভিন্ন গ্রন্থের অনুবাদ শুরু হয় এবং মামুনের সময় তাঁর বিকাশ ঘটে। তিনি এথেন্স, সিরিয়া, এশিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশ হতে প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়ে এগুলো বিখ্যাত পণ্ডিতদের দ্বারা অনুবাদ করান। তিনি প্লেটো, এরিস্টটল, স্ট্যালেন, হিপোক্রেটসু প্রভৃতি দার্শনিকদের গ্রন্থসমূহ আরবিতে অনুবাদের ব্যবস্থা করেন। কোষ্টা, গ্রীক, সিরীয় ও ক্যালডীয় ভাষার গ্রন্থাবলী, মানকা ও দুবান সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ভারতীয় গ্রন্থাবলী এবং মুসা প্রমুখ ফারসী গ্রন্থাবলীকে আরবীতে অনুবাদ করেন। তিনি অনুবাদকদের প্রতি মাসে ৫০০ দিনার পারিশ্রমিক দিতেন। বিশেষ করে হুসাইন বিন ইসহাককে পুস্তকের সমপমিাণ স্বর্ণমুদ্রা দিতেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক মুর বলেন, "এই সকল মনীষীদের পরিশ্রমের ফলে মধ্যযুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন ইউরোপীয় জাতিসমূহ তাদের নিজস্ব অথচ হারানো দন প্রাচীন গ্রীসের বিজ্ঞান ও দর্শনের সংগে পুনরায় পরিচিত হয়।"

বাইতুল হিকমা প্রতিষ্ঠা ঃ খলিফা মামুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তার মধ্যে ৮৩০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত বাইতুল হিকমা স্থাপন যথেষ্ট প্রশংসার দাবিদার। তিনি অনুবাদকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বাইতুল হিকমা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। এই বাইতুল হিকমা মোট তিনটি শাখা নিয়ে গঠিত ছিল। এর মধ্যে ছিল গ্রন্থাগার, শিক্ষায়তন ও অনুবাদ দপ্তর। তৎকালীন নাম করা পণ্ডিত হুসাইন বিন ইসহাকের ওপর এই প্রতিষ্ঠানটির দয়িত্বভার অর্পণ করা হয়। অমুসলমান পণ্ডিতরাও এই প্রতিষ্ঠানে স্বাধীনভাবে গবেষণার সুযোগ পান। যার জন্য শিক্ষা ও জ্ঞান

বিস্তারে বাগদাদকে ইউরোপীয়গণ অনুকরণের সুযোগ লাভ করে। এই গ্রন্থাগারে পারসিক, হিন্দু, গ্রিক, খ্রিস্টান, আরবসহ অন্যান্য সকল শ্রেণীর লোক শিক্ষামূলক গবেষণা, বিজ্ঞান চর্চা ও অনুবাদের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। মামুনের রাজত্বকালে বাইতুল হিকমা ছিল শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র। এটা চিরদিন বিশ্ব শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে অম্লান হয়ে থাকবে।

মৌলিক গবেষণার উৎকর্ষ সাধন ঃ তিনি শুধু বিভিন্ন গ্রন্থের অনুবাদই করেননি। তাঁর সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে মৌলিক গবেষণার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। জ্যোতির্বিদ্যা গবেষণার জন্য তিনি সর্বপ্রথম শামসিয়াতে একটি মানমন্দির (Observatory) প্রতিষ্ঠা করেন। তাছাড়ও ওয়াসিত, আপামিয়া নামক স্থানেও মানমন্দির স্থাপন করা হয়। তিনিই ইয়াহিয়া বিন আল-মনসুর, সিন্দ বিন আলী নামক গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদকে মানমন্দিরের পরিচালক পদে নিয়োগদান করেন। তারা সে সময় পৃথিবীর আকৃতি সম্পর্কে ইউরোপীয়দের ধারণা ভুল প্রমাণ করেন। তাঁরা পৃথিবীর আকৃতি, গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু, বিষুব রেখা, অক্ষাংশ সম্পর্কে সঠিক তথ্য আবিষ্কার করেন। মুসলমানদের এ অবদান প্রসঙ্গে ড্রাপার বলেন, "আরবগণ নভোমণ্ডলে যে হস্তছাপ রেখে গেছেন তা যে কোন ব্যক্তি ভূমণ্ডলের নক্ষত্র সম্বন্ধীয় জ্ঞান আহরণ কালে উপলব্ধি করতে পারবেন।" আবু হাসান নামক একজন বৈজ্ঞানিক দূরবীক্ষণ যন্ত্র ও নৌ-কম্পাস আবিষ্কার করেন। সে সময়েরই বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ও ভূগোলবিদ ছিলেন মুহাম্মদ বিন মূসা আল-খাওয়ারিজমী। সে সময়ে রসায়ন শাস্ত্রের জাবির ভস্মীকরণ (Calcination) ও লঘুকরণ (Reduction) সূত্র দুটি আবিষ্কার করেন।

ধর্ম, সাহিত্য ও দর্শনের বিকাশ ঃ তিনি সাহিত্য ও ধর্মের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য, ইতিহাস ও ধর্মতত্ত্বের অনেক গ্রন্থ রচিত হয়। ধর্মতত্ত্ব, হাদীস ও আইন শাস্ত্রের আলোচনাকে তিনি উৎসাহিত করতেন এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় এ বিষয়ে ব্যাপক চর্চা অবাধ গতিতে চলতে থাকে। তিনি প্রতি মঙ্গলবার তাঁর দরবারে সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা সভায় মিলিত হতেন। সেখানে অত্যন্ত শিক্ষণীয় বক্তৃতা ও আলোচনা সভা হত। তাঁর সময়ে ফারসি সাহিত্য নবজীবন লাভ করে। ফারসি কবিতার জনক ছিলেন মার্বের কবি আব্বাস। তাঁর সময়ে যথেষ্ট ধর্মচর্চা হয়। হাদীস শাস্ত্রবিদ ইমাম বুখারী, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ও দার্শনিক আল-কিন্দী তার রাজদরবারকে অলংকৃত করেন। তিনি হাদীস চর্চার যথেষ্ট সুযোগ দান করেন। তাছাড়া খলিফা মামুনের রাজত্বকালে হস্তশিল্পের বিকাশ ঘটে। তার সময়ে একজন বিখ্যাত হস্তলিপিকার ছিলেন, আবু রায়হান। আর তাঁর নামানুসারে রায়হানী লিখন পদ্ধতি তখন আব্বাসীয় যুগে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে।

মু'তাযিলা মতবাদের প্রচলন ঃ খলিফা মামুন মু'তাযিলা মতবাদের একজন সমর্থক ছিলেন। তিনি ইসলামের বিভিন্ন নিয়ম-নীতি জানার জন্য চার মাযহাব সম্পর্কে গভীর ধারণা লাভ করেন। তিনি ইসলামের মৌলিক-নীতিসমূহ মেনে চলতেন। তিনি ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে উদাহরণ ও যুক্তির মনোভাব গ্রহণ করতেন। তিনি ধর্মীয় গোঁড়ামী এবং প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের হাত থেকে মুসলিম সমাজকে রক্ষার জন্য মু'তাযিলা মতবাদ গ্রহণ করেন। তিনি মু'তাযিলা মতবাদকে রাষ্ট্রীয়ভাবেও স্বীকৃতি দেন।

গণিত, চিকিৎসা ও ভূগোলবিদ্যা ঃ মুহাম্মদ বিন মূসা ছিলেন মামুনের রাজত্বকালের খ্যাতনামা গণিতজ্ঞ ও ভূগোলবিদ। তাঁর সময়কার নামকরা চিকিৎসাবিদ হিসেবে তাঁর রাজসিংহাসনকে অলংকৃত করেন ইউহান্না বিন মোসওয়াহ। তিনি অবশ্য সর্বপ্রথম চোখের রোগ সংক্রান্ত পুস্তক রচনা করে সুনাম অর্জন করেন। আল-খাওয়ারিজমী বীজগণিত সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর গ্রন্থ ইউরোপের নামকরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত হয়।

সর্বক্ষেত্রে বুদ্ধি-বৃত্তির বিকাশ

আব্বাসীয় খলিফা আল-মনসুর ও হারুন- জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং বুদ্ধি-বৃত্তি চর্চার যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন মামুনের চেষ্টায় তা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়। ঐতিহাসিক আমীর আলী বলেন, মামুনের খিলাফত সারাসিনীয় ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় এবং একে যথার্থভাবে ইসলামের অগাস্টান যুগ বলা হয়েছে। তাঁর বিশ বছরের শাসনকাল চিন্তাধারার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে মুলসানদের বুদ্ধি বৃত্তি বিকাশের স্থায়ী স্মৃতি চিহ্ন রেখে গেছে।" শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুসলমানদের এ সাফল্য বিজ্ঞান বা সাহিত্যের কোন বিশেষ শাখার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তা বুদ্ধি বৃত্তির সর্বক্ষেত্রে প্রসার লাভ করেছিল। সংস্কৃতির বিকাশের সাথে সাথে আর্থ-সামাজিক উৎকর্ষ ও সমৃদ্ধি জন্যও মামুনের অবদান অনবদ্য।

সার-সংক্ষেপ

শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার যে স্বর্ণযুগ হিসেবে খ্যাতি লাভ করে আব্বাসীয় যুগ তার মূল অবদান ছিল খলিফা আল-মামুনের। শিক্ষা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের যে বিকাশ তিনি ঘটান তা শুধু আরব সভ্যতার জ্ঞানভাণ্ডারকেই সমৃদ্ধ করেনি বরং বিশ্ব সভ্যতা ও সমৃদ্ধি অর্জন করে। তাঁর সময় শুধুমাত্র মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতিই ঘটেনি বরং সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে মুসলমানদের উন্নতি সাধিত হয়। আল-মামুনের রাজত্বকালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যা অভূতপূর্ব উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল তা বিবেচনা করে অনেক ঐতিহাসিক একে মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ "The golden age of Muslim civilization." বলে অভিহিত করেছেন। আবার অনেকে তাঁর রাজত্বকালকে রোম সম্রাট অগাস্টানের সাথে তুলনা করেছেন। আসলে মামুনের রাজত্বকাল অগাস্টানের যুগ অপেক্ষাও উজ্জ্বল ও গৌরবময় ছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৯.৯

অল্পকথায় উত্তর দিন-

১. 'আব্বাসীয় তথা সমগ্র মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিদ্যোৎসাহী খলিফা ছিলেন আল-মামুন' মন্তব্য করুন।
২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী আয়ের ব্যাপারে আল-মামুন কি করেছিলেন?
৩. অনুবাদের ক্ষেত্রে মামুনের অবদান কি?
৪. বাইতুল হিকমায় কয়টি শাখা ছিল ও কি কি?
৫. 'মান মন্দির' কি? মামুনের মানমন্দিরের দায়িত্বে কে ছিলেন?
৬. দূরবীক্ষণ যন্ত্র কার সময়ে আবিষ্কৃত হয়।
৭. সর্বপ্রথম চোখের রোগ সম্পর্কে কোন বিজ্ঞানী পুস্তক রচনা করেন।
৮. বীজগণিতের উপর কে গ্রন্থ রচনা করেন?

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় খলিফা মামুনের অবদান বর্ণনা করুন।
২. বাইতুল হিকমা কি? এর উপর একটি টীকা লিখুন।
৩. গবেষণার উৎকর্ষ সাধনে মামুনের প্রয়াসের বর্ণনা দিন।
৪. মামুনের সর্বক্ষেত্রে বুদ্ধি-বৃত্তির বিকাশ সাধিত হয়। মন্তব্য করুন।

পাঠ ১০ বুয়াইয়া বংশের উত্থান ও পতন (৯৪৫-১০৫৫ খ্রি.)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বুয়াইয়া বংশের পরিচয় ও তাদের উত্থান বর্ণনা করতে পারবেন
- কয়েকজন বুয়াইয়া শাসকের শাসনকাল আলোচনা করতে পারবেন
- বুয়াইয়া বংশের পতন ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

খলিফা কাহেরের শাসনামলে বুয়াইয়া শক্তির উদ্ভব হয়। বুয়াইয়া ছিল পারস্য শাহ বাহরাম গোর অথবা ইয়াযদজরদের বংশধর দাইলামের অধিবাসী। এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আবু সুজা বুয়াইয়া। আবু সুজা বোখরার সামানীয়দের অধীনে চাকরি করতেন। তাঁর তিন পুত্র ছিল– আহমদ, আলী ও হাসান। তারা ৯৩৬ সালের মধ্যে ইরান, ইস্পাহান, সিরাজ, আহওয়াজ খুজিস্তান এবং কিরমান প্রভৃতি স্থান সামানীদের নিকট হতে উদ্ধার করে এক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন।

বুয়াইয়াদের উত্থান

বুয়াইয়াদের প্রতিষ্ঠা লাভ ঃ বুয়াইয়া যখন প্রভূত শক্তির অধিকারী, তখন আব্বাসীয় খলিফা মুস্তাকফী বাগদাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি তুর্কী বাহিনীর ঔদ্ধত্যমূলক ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে বুয়াইয়া দলপতি আহমাদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। আহমাদ খলিফার আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে সসৈন্যে বাগদাদ অভিমুখে রওয়ানা হন। আহমাদ বাগদাদে প্রবেশ করে তুর্কীদের পরাভূত ও বিতাড়িত করেন। এতে মুসতাক্ফী সন্তুষ্ট হয়ে তাকে আমীরুল উমারা নিযুক্ত করেন এবং তাঁকে "মুইজ-উদ-দৌলাহ" উপাধিতে ভূষিত করেন। এছাড়াও তাঁর অন্য দুভাইকে যথাক্রমে ইমাদুদ্দৌলাহ এবং রুকনউদ্দৌলাহ উপাধিতে অভিষিক্ত করা হয়। এভাবে আহমদ বাদগাদের প্রকৃত ক্ষমতার নিয়ামক হলেন। তিনি তার পিতার নামানুসারে বংশের নাম বুয়াইয়া রাখেন। বুয়াইয়া আমীরগণ বাগদাদের খলিফাদেরকে নিজেদের হাতের পুতুল হিসেবে পরিগণিত করেন। কার্যত: এরাই ৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০৫৫ পর্যন্ত বাগদাদের খিলাফত পরিচালনা করেন।

মুইজুদ্দৌলাহ (৯৪৫-৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ)

মুইজুদ্দৌলাহ্ বুয়াইয়া বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। তিনি স্বীয় দক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে আমীরুল উমরা পদে অধিষ্ঠিত হন। অল্পদিনেই তিনি খুব শক্তিশালী হয়ে উঠেন। এমনকি খলিফার ওপর সুস্পষ্ট প্রাধান্য বিস্তার করতেও তিনি সফল হন। খুতবাতে খলিফার পাশাপাশি তাঁর নামও উচ্চারিত হত। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক আমীর আলী বলেন- "ফ্রান্সের মেরাভিঞ্জিয়ান রাজাদের শাসনকালে চার্লস মার্টিলের যেরূপ মর্যাদা ছিল, তাঁর মর্যাদাও সেরূপ ছিল। কারণ তিনিই প্রকৃত সার্বভৌমত্বের অধিকারী ছিলেন। খলিফা তাঁর আশ্রিত মাত্র ছিলেন এবং তিনি রাজকোষ হতে দৈনিক ৫,০০০ দিনার ভাতা হিসেবে পেতেন।"

বুয়াইয়াদের প্রবল ক্ষমতার প্রতি খলিফা মুস্তাকফীর অসন্তুষ্ট হয়ে তাদের দাপট নস্যাত করতে ষড়যন্ত্র শুরু করেন। অবশেষে মুইজুদ্দৌলাহ ষড়যন্ত্রের জবাব দেন। ৯৪৬ সালে খলিফাকে অন্ধ করে সিংহাসনচ্যুত করেন। অতঃপর তিনি মুস্তাকফীর পুত্র আল মুতীকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন।

মুইজুদ্দৌলাহ্ অনেকটা নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিলেন। তিনি বিদ্যানুরাগী ছিলেন তবে তাঁর আমলে শিল্প-সাহিত্যের উন্নতি হয়। জনহিতকর কার্যেও তাঁর অবদান ছিল। শি'য়াদের প্রভাব-প্রতিপত্তি তাঁর আমলে জোরদার হয়। কারবালার মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের স্মরণে ১০ই মহররম শোক দিবস পালনের রীতি প্রচলন করেন। তিনি বাগদাদ নগরীর গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। ৯৬৭ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ইজ্জুদ্দৌলাহ (৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ)

মুইজ-উদ-দৌলাহর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বখতিয়ার ইজ্জুদ্দৌলাহ উপাধি ধারণ করে আমীরুল উমারার পদে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু তিনি ছিলেন দুর্বল মনের অধিকারী। শাসন পরিচালনা করার যোগ্যতাও তাঁর মধ্যে ছিল না। তাই এ সুযোগে রুকনুদ্দৌলাহর পুত্র আজদুদ্দৌলাহ্ তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে নিজেই সিংহাসন লাভ করেন।

আজদুদ্দৌলাহ (৯৬৭-৯৮৩ খ্রি.)

আজদুদ্দৌলাহ্ আমীরদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং খ্যাতিমান শাসক ছিলেন। তিনি বুয়াইয়া শাসকদের মধ্যে ক্ষমতার চরম শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন। বুয়াইয়া আমীরদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ইরাক ও পারস্যের ছোট ছোট রাজ্যগুলোকে একত্র করে তিনি একটি সাম্রাজ্য সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর ক্ষমতার প্রতি খলিফা সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে সুলতান উপাধি প্রদান করেছিলেন। শাসক হিসেবে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ শাসকদের মধ্যে তিনি আপন মহিমায় ভাস্বর ছিলেন। জুমার খুতবায়ও তাঁর নাম পড়া হত। মুদ্রায় তাঁর নাম অঙ্কিত করার এবং তাঁর প্রাসাদের দরজায় দৈনিক তিনবার ঢোল পেটাবার জন্য খলিফা অনুমতি দিয়েছিলেন।

আজদুদ্দৌলাহ্র শাসনামলে বুয়াইয়া সাম্রাজ্য কাস্পিয়ান সাগর হতে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত এবং ইস্পাহান হতে আরম্ভ করে সিরিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। তিনি প্রজাহিতৈষী ছিলেন এবং অনেক জনহিতকর কার্যাবলীর সহযোগিতা ও শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাঁর পরেই ক্রমশ বুয়াইয়া বংশ অবনতির দিকে ধাবিত হয়।

পরবর্তী বুয়াইয়াগণ

আজদুদ্দৌলাহ্র মুত্যুর পর তাঁর পুত্র শামসুদ্দৌলাহ্ 'শামসুল মিল্লাহ' উপাধি ধারণ করে আমীরুল উমারার পদ লাভ করেন। কিন্তু অল্পদিন পরেই শাসসুদ্দৌলাহ্র ভাই শরাফউদ্দৌলাহ্ কর্তৃক পদচ্যুত হন। শরাফউদ্দৌলাহ্ ৯৮৩-৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত উক্ত পদে ছিলেন। ৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র নসর বাহাউদ্দৌলাহ্ উপাধি ধারণ করে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। আব্বাসীয় খলিফা আততাইকে সিংহাসনচ্যুত করে ৯৯১ খ্রিস্টাব্দে বাহাউদ্দৌলাহ আল-কাদির বিল্লাহকে আব্বাসীয় খিলাফতে অভিষিক্ত করেন। খলিফা কাদিরের সময় হতে বুয়াইয়াদের ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে। এ সময় সুলতানুদ্দৌলাহ ১০১২-১০২৪ খ্রি. ইমাদুদ্দীন ১০২৪-১০৪৮ খ্রিস্টাব্দ আমীর-উল-উমারাহ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এদের শেষ সুলতান ছিলেন আমীর-উল-উমারাহ মালিক আর রহিম (১০৪৮-১০৫৫ খ্রিস্টাব্দ)। সেলজুক বংশের প্রতিষ্ঠাতা তুগ্রিল বেগ কর্তৃক বুয়াইয়াদের বিতাড়িত হওয়ার সাথে সাথে এ বংশের অবসান ঘটে।

বুয়াইয়া বংশের পতন

১. শিয়া-সুন্নী বিদ্বেষ ঃ বুয়াইয়াদের শাসনামলে শিয়া-সুন্নী বিদ্বেষ চরমাকার ধারণ করে। বুয়াইয়ারা ছিল শিয়া। আব্বাসীয় খলিফারা তাদের হাতে ক্রীড়নকে পরিণত হয়। বুয়াইয়াগণই খিলাফতের প্রকৃত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হলে সুন্নী আব্বাসীয় খলিফারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন।

২. আরব ও পারস্য দ্বন্দ্ব ঃ বুয়াইয়া বংশের উত্থানের ফলে আরবের ওপর পারসিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রশাসনের সর্বস্তরে পারসিকদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। আরবের অভিজাত শ্রেণী কিছুতেই একে মেনে নিতে পারেনি।

৩. বুয়াইয়াদের দুর্বলতা ঃ শাসকদের মধ্যে আজদুদ্দৌলাহর পরবর্তী শাসকবর্গ ছিলেন দুর্বল ও অযোগ্য। ফলে তারা সাম্রাজ্যকে ধরে রাখতে পারেনি।

৪. বুয়াইয়াদের সীমাহীন অত্যাচার ঃ বুয়াইয়া আমীরগণ নিজেদের খেয়াল-খুশি মত খলিফা নির্বাচন করতেন এবং সিংহাসনে বসাতেন। অনেক শাসকই জনগণের ওপর সীমাহীন অত্যাচার করত। ফলে তারা অতিষ্ঠ হয়ে মুক্তির আশায় সুশাসক খুঁজছিলেন।

৫. সেলজুকদের আক্রমণ ঃ বুয়াইয়াদের আক্ষলহ, বিদ্রোহ ও গৃহযুদ্ধের সুযোগে সুন্নী মতাবলম্বী সেলজুক বংশের প্রতিষ্ঠাতা তুগ্রিল সর্বশেষ বুয়াইয়া শাসক মালিক রহীমকে পরাজিত ও বহিষ্কার করে বুয়াইয়া শাসনের অবসান ঘটান।

বুয়াইয়াদের অবদান

বুয়াইয়া বংশের সকল শাসকই ছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা মুইয-উ-দৌলাহ বিদ্যানুরাগী এবং শিল্প-সাহিত্যের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এ বংশের শ্রেষ্ঠশাসক আজদু দৌলাহ জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য ও স্থাপত্য কলায় বিশেষ অবদান রাখেন। তিনি নিজে জ্ঞানী এবং গণিত শাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক, দার্শনিক তাঁর রাজদরবার শোভা বর্ধন করেছিলেন। ঐতিহাসিক মাসুদী, দার্শনিক আল-ফারাবী, আবু-নসর, কবি-মুতানব্বী, ভাষাবিজ্ঞানী আলী আল-ফারসী এবং কিতাবুল আগানীর সংকলনক আবুল ফারাজ প্রমুখ মনীষীগণ ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। বিশ্ববিখ্যাত চিন্তাবিদ ইখওয়ানুস সাফা সম্প্রদায় দর্শনের ক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতি লাভ করছেন। জ্যোতির্বিদ ইবনুস আলম, গণিতবিদ আবু ওয়াফা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। বুয়াইয়া বংশের শরফুদ্দৌলাহ ও বাহউদ্দৌলা-এর শাসনামলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হয়। এই

উভয় শাসকই ছিলেন বিদ্যোৎসাহী। শরফুদ্দৌলাহ একটি মানমন্দির এবং বাগদাগে একটি বিরাট পাঠাগারসহ একাডেমী স্থঅপন করেছিলেন। এভাবে বুয়াইয়া শাসনমালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিপুল উৎকর্ষ সাধিত হয়।

সার-সংক্ষেপ
বুয়াইয়া শাসকবর্গ নিজেদের ক্ষমতা ও যোগ্যতায় একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যের জন্ম দিয়ে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছিলেন। কিন্তু সীমাহীন অত্যাচার, অযোগ্যতা, দুর্বলতা ও আত্মকলহের কারণে তাদের পতন ত্বরান্বিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৯.১০

এক কথায় উত্তর দিন-

১. কোন খলিফার আমলে বুয়াইয়াদের উদ্ভব হয়?
২. বুয়াইয়া কে ছিলেন?
৩. বুয়াইয়া বংশের প্রতিষ্ঠা কে ছিলেন?
৪. তাঁরা কত সালে কোথায় কোথায় স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন?
৫. বুয়াইয়া বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কাকে মনে করা হয়?
৬. কে খলিফাকে অন্ধকারে সিংহাসনচ্যুত করেন?
৭. মুইজ-উজ-দৌলার মৃত্যুর পর কে আমীরুল উমারার পদে অধিষ্ঠিত হন?
৮. আমীরদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও খ্যাতিমান শাসন কে ছিলেন?
৯. বুয়াইয়াদের পতনের একটি কারণ নির্দেশ করুন।
১০. বুয়াইয়া বংশের অবদানের মধ্যে একটি বিশেষ অবদানের কথা বলুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. বুয়াইয়াদের পরিচয় দিন।
২. বুয়াইয়া বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে মুইজুদ্দৌলাহর মূল্যায়ন করুন।
৩. 'আজদুদ্দৌলাহ বুয়াইয়া আমীরদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং খ্যাতিমান শাসক ছিলেন।" -বিশ্লেষণ করুন।
৪. বুয়াইয়া বংশের পতনের কারণ নির্দেশ করুন।
৫. বুয়াইয়াদের অবদান মূল্যায়ন করুন।

পাঠ ১২ সেলজুক বংশের উত্থান-পতন (১০৫৫-১১৯৪ খ্রি.)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সেলজুক বংশের উত্থান সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন
- সেলজুক বংশের পতনের কারণ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

সেলজুকরা মধ্য এশিয়ার বিখ্যাত তুর্কী গোত্রীয় ঘুজ বংশের লোক ছিল। সেলজুক বিন তুকাক-এর নামানুসারে এ বংশের নামকরণ করা হয়েছে। একাদশ শতাব্দীতে তাদের ইতিহাস শুরু হয়। তারা তুর্কীস্তান হতে ট্রান্স অক্সিয়ানায় প্রবেশ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এক পর্যায়ে তারা অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

সেলজুক বংশের উত্থানের ইতিহাস

১. তুগ্রিল বেগ (১০৩৭-১০৬৩ খ্রি.)

সেলজুকের পুত্র তুগ্রিল বেগের মাধ্যমেই সেলজুক বংশ প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তিনি বল্‌খ, জুরজান, খাওয়ারিজম, তাবারিস্তান, হামাদান, রাই, ইস্পাহান প্রভৃতি অঞ্চল জয় করে কৃতিত্ব অর্জন করেন। এ সময় আব্বাসীয় খলিফা আল কাইয়ুম বিল্লাহ বুয়াইয়া আমীরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তুগ্রিল বেগের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তুগ্রিল বেগ আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১০৫৫ সালে বাগদাদের শেষ বুয়াইয়া মালিক রহিমকে পরাজিত ও বিতাড়িত করে বাগদাদ দখল করেন। খলিফা তার কর্মে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে সুলতান উপাধিতে ভূষিত করেন। অবশ্য তুগ্রিল বেগ ১০৫৮ সালে আরসালান কর্তৃক খলিফা কাইয়ুমের সিংহাসন চ্যুতিতেও গর্জে উঠেন। পরে বাগদাদ পুনরায় দখল করে কাইয়ুমকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। তুগ্রিল বেগ সব সময় বাগদাদে উপস্থিত না থেকেও একজন প্রতিনিধির মাধ্যমে খলিফার ওপর আধিপত্য বজায় রাখতেন।

তুগ্রিল বেগ অত্যন্ত উদার, সরল ও কর্তব্য পরায়ণ সুশাসক ছিলেন। সাহসী যোদ্ধা হিসেবেও তার সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি শিয়া প্রভাব খর্ব করে সুন্নী কর্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠা করেন। ঐতিহাসিক আমীর আলীর মতে- তুগ্রিলের আমলে সেলজুকগণ এশিয়ায় একটি প্রতাপশালী জাতিতে পরিণত হয়। মার্ভে তাঁর কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। গজনীর সুলতান মাহমুদের পুত্র মাসুদকে পরাজিত করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর দীর্ঘ ২৫ বছর রাজত্ব পরিচালনা করে ১০৬৩ সালে মৃত্যু বরণ করেন। তিনি একজন সুদক্ষ ও প্রতিভাশালী শাসক ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে সেলজুকগণ এক প্রতাপশালী জাতিতে পরিণত হয়। তিনি জ্ঞানী-গুণী দানশীল এবং ধার্মিক ছিলেন।

২. আল্‌প আরসালান (১০৬৩-১০৭২ খ্রিস্টাব্দ)

তুগ্রিল বেগের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতুস্পুত্র আল্‌প আরসালান সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৪৬২ হিজরিতে মক্কার শাসনকর্তা মুহাম্মাদ বিন আবু হাশিম খুতবা থেকে ফাতেমি নাম বাদ দিয়ে আলপ আরসালানের নাম নিতে শুরু করেন। তিনিও একজন সুদক্ষ সুলতান ছিলেন।

সুলতান তুগ্রিলের সময় বাইজানটাইন সম্রাটের সাথে যে সংঘর্ষের সূচনা হয়েছিল- আলপ-আরসালানের সময় তা চরম আকার ধারণ করে। ৪৬৩ হিজরিতে রোমানরা লক্ষাধিক সৈন্য নিয়ে অতর্কিতে মুসলিম এলাকায় হামলা করলে আল্প আরসালান মাত্র ১৫,০০০ সৈন্য নিয়ে তাদের মোকাবিলা করেন এবং সফলতার সাথে জয়লাভ করেন। এ যুদ্ধে সম্রাট স্বয়ং এবং অসংখ্য সৈন্য বন্দী হয়। সম্রাট তার কন্যার সাথে আল্প আরসালানের পুত্রের বিবাহ, বার্ষিক কর, মুসলিম বন্দী মুক্তির প্রতিশ্রুতি এবং ৫০ বছর মেয়াদী সন্ধি চুক্তি করে সবাইকে ছাড়িয়ে নেন। আল্‌প আরসালান ১০৭৩ সালে ইন্তিকাল করেন। দুর্বল আব্বাসী খলিফাদের সাথে তাঁর সু সম্পর্ক ছিল। তিনি মার্ভ থেকে ইস্পাহানে তাঁর রাজধানী স্থানান্তর করেন।

৩. মালিক শাহ (১০৭২-১০৯২ খ্রিস্টাব্দ) ঃ আল্প আরসালানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মালিক শাহ্ জালালুদ্দৌলা উপাধি নিয়ে ১০৭৩ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর রাজত্বকালে সেলজুক সাম্রাজ্য উন্নতি ও গৌরবের শিখরে আরোহণ করে। মালিক শাহ্ রাজত্বের প্রথম দিকে কয়েকটি বিদ্রোহ দমন করেন। কিন্তু রাজ্য জয় অপেক্ষা শাসন সংস্কারের দিক দিয়ে মালিক শাহ্ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর শাসনামলে চীনের সীমান্ত হতে ভূ-মধ্যসাগর পর্যন্ত এবং উত্তরে জর্জিয়া হতে দক্ষিণে ইয়েমেন পর্যন্ত বিস্তৃত-বিশাল সাম্রাজ্যে শান্তি বিরাজ করত। আব্বাসীয় খলিফা হারুন ও মামুনের মত বণিক, হজ্জযাত্রী এবং পথিকদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য তিনি পাহারাদার নিয়োগ ও বিশ্রামাগার নির্মাণ করেছিলেন। এছাড়াও তিনি বহু মসজিদ, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও রাস্তাঘাট নির্মাণ, খাল খনন ইত্যাদি কার্যাবলী সম্পন্ন করেছিলেন।

উজির নিযামুল মূলক

মালিক শাহ্ খাজা হাসান নিযামুল মূলককে উজির পদে নিযুক্ত করেন এবং 'আতাবেগ' উপাধি দান করে সম্পূর্ণ প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী করেছিলেন। মূলত নিযামুল মূলকের কর্মকুশলতা ও বিচক্ষণতার ফলেই মালিক শাহর রাজত্বকাল মহিমান্বিত ও চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন- "সম্ভবত ইয়াহইয়া বার্মাকীর পর নিযামুল মূলকই এশিয়ার একমাত্র যোগ্যতম মন্ত্রী ও শাসনকর্তা।" তিনি আরও বলেন- "ইসলামের রাজনৈতিক ইতিহাসে নিযামূলক মূলক অলংকার স্বরূপ।" তাঁর রচিত 'সিয়াসতনামা' আজও সমাদৃত। নিজাম শাহর পরামর্শে মালিক শাহ্ একটি মানমন্দির স্থাপন করেন এবং পারসিক পঞ্জিকা সংস্কার করে জালালী দিন পঞ্জিকা প্রস্তুত করেছিলেন। ১০৪৭ খ্রিস্টাব্দে মালিক নিযামুল মূলকের পরামর্শে একটি জ্যোতির্বিদ সম্মেলন করেন। কিন্তু এ মহান ব্যক্তিত্বকে 'গুপ্তঘাতক' সম্প্রদায় হত্যা করে ফেলে।

সেলজুক বংশের পতন

যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাব ঃ সেলজুক বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান মালিক শাহ্র মৃত্যুর পর তাঁর ন্যায় কোন যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিল না। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্রদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় ও রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায়। ফলে শাসনতান্ত্রিক অবকাঠামো ভেঙে যায়।

নিযামুল মূলকের অকাল মৃত্যু ঃ সেলজুক বংশের মন্ত্রী নিযামুল মূলক ছিলেন সেলজুক রাজত্বের অলংকারস্বরূপ। তাঁর কর্মকুশলতায় সাম্রাজ্যের ভীত মজবুত হয়েছিল। কিন্তু গুপ্তঘাতক কর্তৃক তাঁর অকাল মৃত্যুতে সেলজুক বংশের পতন ত্বরান্বিত হয়।

আদর্শচ্যুতি ঃ সেলজুক বংশের রাজত্বের ভিত্তি যে আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, মালিক শাহ্র পরবর্তী শাসকবর্গ সে আদর্শ থেকে অনেক দূরে সরে পড়েছিলেন। ফলে পতন ত্বরান্বিত হয়।

সেলুজুক বংশের অবদান ঃ সেজলুক বংশ ১০৫৫ থেকে ১১৯৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাগদাদের শাসন পরিচালনা করেছিলেন। তাঁরা ক্ষমতায় এসে মুসলিম বিশ্বে ঐক্য, সংহতি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। তারা জনগণের মধ্যে বিশেষ করে সুন্নী মুসলিমদের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনেন। মুসলিম শিক্ষা ও সংস্কৃতি ও সভ্যতায় তাদের অবদান অসামান্য, তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা উৎকর্ষ লাভ করে। বিখ্যাত দার্শনিক ইমাম গাযালী, মনীষী ওমর খৈয়াম, সাহিত্যিক নিজামী, কবি ফরিদ উদ্দীন আত্তার কবি ও পর্যটক নাসির-ই-খসরু প্রমুখ ব্যক্তিগণ তাদের সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অসামান্য অবদান রেখেছিলেন। স্থাপত্য শিল্পে ও সেলজুক সুলতানদের অবদান অবিস্মরণীয়। তারা ইসলামের বিস্তার এবং এশিয়া মাইনরে মুসলিম শাসন এবং রোমান অঞ্চলে ইসলামের প্রসার ঘটান।

সার-সংক্ষেপ

সেলজুক বংশ এশিয়ায় শাসন প্রতিষ্ঠা করে যে কৃতিত্ব অর্জন করেছিল, তা ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। তুগ্রিল বেগ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সেলজুক রাজত্ব পশ্চিম এশিয়ার সীমান্তে অবস্থিত কাবুল হতে রোমান ভূখণ্ডের ইউনানী হুকুমাত ও মিশরের ফাতেমি হুকুমাত পর্যন্ত সমগ্র এলাকায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৯.১১

এক কথায় উত্তর দিন ঃ

১. সেলজুকগণ কোন বংশের লোক ছিলেন?
২. কার নামানুসারে এই বংশের নামকরণ করা হয়?
৩. সেলজুক বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে?
৪. তুগ্রিল বেগ কত বছর রাজত্ব করেন?
৫. আলপ আরসালান কে ছিলেন?
৬. মালিক শাহ কি নাম ধারণ করে সিংহাসনে বসেন?
৭. মালিক শাহের রাজ্যের সীমা কি ছিল?
৮. খাজা নিযামুল মূলক কে?

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. সেলজুক বংশের উত্থান ও পতন সম্বন্ধে বর্ণনা দিন।
২. তুগ্রিল বেগের রাজত্ব কাল বর্ণনা করুন।
৩. মালিক শাহের শাসনামল কেমন ছিল?
৪. নিযামুল মূলক সম্বন্ধে একটি টীকা লিখুন।
৫. সেলযুকদের হকদের অবদান মূল্যায়ন করুন।

ক্রুসেডের কারণ ও ফলাফল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ক্রুসেডের পারিচয় বলতে পারবেন
- ক্রুসেডের কারণ বর্ণনা করতে পারবেন
- ক্রুসেডের ফলাফল আলোচনা করতে পারবেন।

জেরুযালেমের ওপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য মুসলমানদের সাথে খ্রিস্টানদের যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় ইতিহাসে তাই ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ নামে পরিচিত। ক্রুসেডারগণ বক্ষে লাল বর্ণের ক্রুশচিহ্ন ব্যবহার করত বলেও এ যুদ্ধ ক্রুসেড নামে অভিহিত।

ক্রুসেডের পরিচয় ঃ জেরুযালেম হলো হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মস্থান। মুসলমান, খ্রিস্টান ও ইহুদীদের পুণ্য ভূমি। এ স্থানটিকে মুসলমানদের নিকট হতে উদ্ধার করার জন্য ইউরোপের খ্রিস্টান এবং প্রাচ্যের মুসলমানদের মধ্যে একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত যে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ইতিহাসে তা ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ নামে পরিচিত। ধর্মের দোহাই দিয়ে খ্রিস্টানগণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিল বলে একে ধর্মযুদ্ধ বলা হয়। আর তারা বক্ষে লোহিত বর্ণের ক্রুশ চিহ্ন ব্যবহার করত বলে এটি ক্রুসেড নামেও পরিচিতি লাভ করে।

ক্রুসেডের কারণ

জেরুযালেমের গুরুত্ব ঃ ধর্মীয় দিক থেকে জেরুযালেমের গুরুত্ব অত্যধিক। কেননা, এটি যীশু খ্রিস্টের জন্মভূমি, মহানবী (স)-এর মিরাজ গমনের স্থান এবং মূসা (আ)-এর বহু স্মৃতি বিজড়িত স্থান হওয়ায় খ্রিস্টান, মুসলমান এবং ইহুদীদের নিকট জেরুযালেম পূণ্য ভূমি হিসেবে বিবেচিত হয়।

ধর্মীয় উম্মাদনা ঃ ঐতিহাসিক আমীর আলী বলেন, খ্রিস্টান ধর্মীয় উন্মাদনাই ক্রুসেড যুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ। খ্রিস্টানরা একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, নিজেদের পাপমোচন, ধনাসম্পদ ও বেহেশত লাভের আশায় এ যুদ্ধে নেমেছিল।

আধিপত্য বিস্তারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঃ মুসলমান ও খ্রিস্টান উভয়েই প্রাচ্যে ক্ষমতা বিস্তারের জন্য পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল। উভয়েরই এ দীর্ঘ সংগ্রাম এক সময় ক্রুসেডের রূপ লাভ করে।

পোপের বাসনা ঃ রোমীয় ধর্মগুরু পোপ সমগ্র খ্রিস্টান জগতে তাঁর প্রভুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড ঘোষণা করেন।

সামন্ত প্রথা ঃ ঐতিহাসিক আর্নেস্ট বার্কারের ভাষায়, ইউরোপের সামন্ত প্রথা ক্রুসেডের অন্যতম কারণ। একাদশ শতাব্দীতে জনসাধারণ সামন্ত প্রথার প্রতি চরম অসন্তোষ প্রকাশ করলে পোপ ও ধর্মযাজকগণ কৌশলে তাঁদের সামরিক দক্ষতাকে ধর্মযুদ্ধের অজুহাত দেখিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করেন।

বাণিজ্যিক কারণ ঃ ভূ-মধ্যসাগরের ওপর মুসলিম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইউরোপীয় বণিকদের ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হয়েছিল। ফলে রুদ্ধ বাণিজ্যদ্বার উন্মুক্ত করার জন্য তারা ক্রুসেডের যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

মুসলমানদের ধ্বংসের বাসনা ঃ মুসলমান কর্তৃক একটি বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা এবং তাদের উন্নতর কৃষ্টি ও সভ্যতার বিকাশে খ্রিস্টান সম্প্রদায় ঈর্ষান্বিত হয়। এজন্যই তারা ইসলামের গৌরব মুছে ফেলার মানসে এবং মুসলিম সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধনের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়।

কমনেনাসের আবেদন ঃ গ্রিক সম্রাট এলিস্কাস কমনেনাস পোপ দ্বিতীয় আরবানের নিকট মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাকে সাহায্যের জন্য আবেদন করেন। প্রকৃতপক্ষে এ আবেদনই ছিল ক্রুসেডের প্রত্যক্ষ কারণ। গ্রীক ও রোমান গীর্জার উপর প্রাধান্য বিস্তার প্রয়াসী পোপ একে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেন। পোপ দ্বিতীয় আরবান ১০৯৫ খ্রি. ফ্রান্সের ক্লারমেন্টে এক সম্মেলনে ইউরোপীয় খ্রিস্ট সমাজ ও রাজন্যবর্গকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ দেন। পোপ মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে ধর্মযুদ্ধ আখ্যা দিয়ে এতে অংশ গ্রহণকারীদের স্বর্গ লাভের প্রতিশ্রুতি দেন। ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা উত্তেজক এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেড় লক্ষ খ্রিস্টান মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য কনস্টানন্টিনোপোলে সমবেত হয়। ফলে ইতিহাসে দীর্ঘতম ধর্মযুদ্ধ ক্রুসেডের সূত্রপাত হয়।

ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ অন্যান্য যে কোন যুদ্ধ অপেক্ষা ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী ছিল। প্রকৃতপক্ষে এ যুদ্ধ আফ্রো-এশিয়ার মুসলিম এবং ইউরোপের খ্রিস্টানদের মধ্যে বিদ্যমান দীর্ঘকালের ঘৃণা-বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্ব-কলহের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। ১০৯৫-১২৯১ খ্রি. পর্যন্ত ৩টি স্তরে ৯টি ক্রুসেডে খ্রিস্টান ও মুসলিম বিশ্ব পরস্পরের মুখোমুখি হয়।

ক্রুসেডের ফলাফল

ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ অন্যান্য যেকোন যুদ্ধ অপেক্ষা ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী ছিল। রক্তক্ষয় ও ভয়াবহতা যতই বীভৎস হোক না কেন, ইউরোপের নবজাগরণ এবং বিশ্ব সভ্যতার উন্নতিতে ক্রুসেডের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। ঐতিহাসিক টয়েনবি যথার্থই বলেছেন, "Modern Europe was born out of the spirit of the crusade."

ধ্বংসাত্মক পরিণতি ঃ প্রকৃতপক্ষে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ ছিল ধ্বংসলীলার প্রতীক স্বরূপ। এ যুদ্ধের ফলে অনেক মুসলমান প্রাণ হারায় এবং বহু নগর শ্মশানে পরিণত হয়। ধ্বংস আর রক্তক্ষয়ই ছিল ক্রুসেডের বিস্ময়কর ফল।

খ্রিস্টানদের আশা নিষ্ফল ঃ খ্রিস্টানগণ বিপুল অর্থ এবং লক্ষ লক্ষ প্রাণ বিসর্জন দিয়েও মুসলমানদের হাত থেকে পবিত্র ভূমি জেরুযালেম উদ্ধার করতে পারেনি।

ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঃ ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্রুসেড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ক্রুসেডের ফলে পাশ্চাত্যের বণিক সম্প্রদায় প্রাচ্যের সাথে বাণিজ্য বিস্তারের সুযোগ লাভ করে। ফলে নৌ-পথে বাণিজ্যের স্পৃহা বদ্ধি পায় এবং নতুন নতুন সামুদ্রিক পথ আবিষ্কৃত হতে থাকে।

সামন্ত প্রথার বিলোপ ঃ ক্রুসেডের ফলে সামন্ত প্রথা বিলুপ্ত হয়ে ইউরোপে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয় এবং রাজকীয় কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব বৃদ্ধি পায়।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্পর্ক ঃ ক্রুসেডের ফলে মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে ভাব বিনিময়ের সুযোগ ঘটে। এর ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঃ শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ক্রুসেডের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। হুইট ওয়েবস্টার বলেন, খ্রিস্টানগণ মুসলমানদের "মার্জিত রুচিজ্ঞান, উন্নততর ভাবধারা ও উদার সহানুভূতি নিয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।"

মুসলমানদের উন্নত ভাবধারার সংস্পর্শে আসার ফলেই ইউরোপে প্রথমে রেঁনেসা ও পরে নব্য ইউরোপের জন্ম হয়।

সার-সংক্ষেপ

একজন ঐতিহাসিকের মতে ক্রুসেড ইতিহাসের সবচেয়ে বিভ্রান্তিকর অধ্যায়ের সূচনা করে। খ্রিস্টীয় ১১শ হতে ১৩শ শতাব্দী পর্যন্ত ২০০শ বছর ধরে ঈর্ষা পরায়ন এবং বিক্ষুব্ধ খ্রিস্টান জগত মুসলমানদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ পরিচালিত করেছিল। ধর্মের নামে বর্মে ক্রুস চিহ্ন ধারণ করে অসংখ্য হতভাগ্য খ্রিস্টান যুবকদের এ ঘৃণ্য যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য প্ররোচিত করা হয়। এ ধর্মযুদ্ধ আফ্রো-এশিয়ান মুসলমানদের বিরুদ্ধে খ্রিস্টীয় ইউরোপের আজন্ম ঘৃনা-বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্ব কলহের বহিঃপ্রকাশ। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের মধ্যে সংঘটিত এ ধর্মযুদ্ধের কারণ যেমন ছিল নানা ধরনের, এর ফলাফল ও তেমনি ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী ছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৯.১২

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. জেরুযালেমের ওপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য মুসলমানদের সাথে খ্রিস্টাব্দের যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় ইতিহাসে তা-ই ..... বা ..... নামে পরিচিত। ক্রুসেডারগণ বক্ষেল লাল বর্ণের ..... ব্যবহার করত বলে এ যুদ্ধ ক্রুসেড নামে অভিহিত।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ক্রুসেডের পরিচয় দিন।
২. ক্রুসেডের কারণ কি কি?
৩. ক্রুসেডের ফলাফল লিখুন।

পাঠ ১৩ গাজী সালাহউদ্দিন আইয়ুবী (১১৭৪-৯৩ খ্রি.)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সালাহউদ্দিন আইয়ূবীর পরিচয়, ও ক্ষমতা লাভ সম্পর্কে বলতে পারবেন
- সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর চরিত্র ও কৃতিত্ব বর্ণনা করতে পারবেন
- আইয়ুবী বংশের পতন সম্পর্কে বলতে পারবেন।

সালাউদ্দিনের পরিচয় ও ক্ষমতা লাভ

গাজী সালাহ্ উদ্দিন আইয়ুবী ১১৩৮ খ্রিস্টাব্দে টাইগ্রিস নদীর তীরে অবস্থিত টাকরিট নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা নাজমুদ্দিন আইয়ুবের নামানুসারে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বংশ 'আইয়ুবী বংশ' নামে অভিহিত হয়ে থাকে। সালাহ উদ্দিনের পিতা নাজমুদ্দিন আইয়ুব ১১৩৯ খ্রিস্টাব্দে ইমামুদ্দিন জঙ্গীর অধীনে লেবাননের বালবেগ দুর্গের সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এ সময় মিসরে মারাত্মক গৃহযুদ্ধ শুরু হলে শেষ ফাতেমীয় খলিফা আজিদ এ সঙ্কট হতে পরিত্রাণ লাভের জন্য নুরুদ্দীন জঙ্গীর সাহায্য প্রার্থনা করেন। ১১৬৭ খ্রিস্টাব্দে নুরুদ্দীন তাঁকে সাহায্য করার জন্য সালাহউদ্দিনের চাচা শিরকুনের নেতৃত্বে একদল সৈন্য মিসরে প্রেরণ করেন। শিরকুন অতি অল্প সময়ের মধ্যে মিসরের বিদ্রোহ দমন করে সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন। কৃতিত্বপূর্ণ কাজের প্রতিদানস্বরূপ খলিফা আজিদ ১১৬৯ খ্রিস্টাব্দে শিরকুনকে মিসরের প্রধানমন্ত্রী ও সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। কিন্তু শিরকুন এ মর্যাদা বেশি দিন ভোগ করতে পারেননি। কারণ তিনি দুই মাসের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তারপর শিরকুনের ভ্রাতুষ্পুত্র সালাহ উদ্দিন খলিফা আজিদের উজীর নিযুক্ত হলেন। ১১৭১ খ্রিস্টাব্দে খলিফা আজিদের মৃত্যুর পর মিসরে ফাতেমীয় খিলাফতের অবসান ঘটে। আজিদের মৃত্যুর পর সালাহউদ্দিন সমগ্র মিসর তাঁর প্রভু নুরুদ্দীন জঙ্গীর কর্তৃত্বাধীনে আনয়ন করেন এবং তাঁর প্রতিনিধিরূপে এটি শাসন করতে থাকেন। তিনি জুমার নামাজের খুৎবায় ফাতেমীয় খলিফাদের পরিবর্তে আব্বাসীয় খলিফা আল-মুসতাদিরের নাম পাঠের রীতি প্রবর্তন করেন। ১১৭৪ খ্রিস্টাব্দে নুরুদ্দীন জঙ্গীর মৃত্যুর পর জঙ্গী বংশের শাসনের অবসান ঘটে এবং সালাহউদ্দিন কায়রোতে রাজধানী স্থাপন করে স্বাধীন সুলতানরূপে মিসরের শাসনদণ্ড পরিচালনা করতে থাকেন। স্বাধীন আইয়ুবী বংশ প্রতিষ্ঠিত করে সালাহ উদ্দিন স্বীয় কর্মদক্ষতা ও রণনৈপুণ্য প্রদর্শনপূর্বক অতি অল্প সময়ের মধ্যে সিরিয়া, ইরাক এবং আরব অঞ্চলে তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন।

হিট্রিনের যুদ্ধ, তৃতীয় ক্রুসেড ও জেরুযালেম পুনরুদ্ধার

আইয়ুবী সাম্রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করে সালাহউদ্দিন ক্রুসেডারদের উৎপাত ও উপদ্রব বন্ধ করার জন্য বদ্ধপরিকর ও কৃতসংকল্প হলেন। ১১৮৭ খ্রিস্টাব্দে সালাহউদ্দিন অপূর্ব রণনৈপুণ্য প্রদর্শনপূর্বক ক্রুসেডারগণকে হিট্রিনের যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে তাদের অধিকৃত বহু স্থান স্বীয় শাসনাধীনে আনয়ন করলেন। ১১৮৭ খ্রিস্টাব্দে অক্টোবর মাসে সালাহউদ্দিন প্রধান ল্যাটিন রাষ্ট্র জেরুযালেম ক্রুসেডারদের নিকট থেকে পুনরুদ্ধার করেন। জেরুযালেম পতনের সংবাদে খ্রিস্টান ক্রুসেডারগণ অধীর হয়ে পড়ল তারা তা উদ্ধারকল্পে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পরার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। এর ফলে তৃতীয় ক্রুসেডের সূত্রপাত হয়। ইংল্যাণ্ডের রিচার্ড, ফ্রান্সের ফিলিপ অগাস্টাস এবং জার্মানির ফ্রেডারিক বারবারোসার নেতৃত্বে ক্রুসেডারগণ আপ্রাণ চেষ্টা করেও জেরুজালেম পুনরাধিকার করতে ব্যর্থ হয়ে ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে নভেম্বর মাসে গাজী সালাহ্উদ্দিনের সাথে সন্ধি স্থাপন করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তৃতীয় ক্রুসেডে গাজী সালাহউদ্দিন যে বীরত্ব ও মহানুভবতা প্রদর্শন করেছিলেন তার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। এ যুদ্ধে খ্রিস্টানগণ সিরিয়া ও অন্যান্য অঞ্চল হতে বিতাড়িত হয়।

চরিত্র ও কৃতিত্ব

১১৯৩ খ্রিস্টাব্দে সালাহউদ্দিন আইয়ুবী দামেশকে ইনতিকাল করেন। তাঁর গৌরবময় কর্মজীবনের অবসান ইসলামের ইতিহাসে একটি বেদনাময় অধ্যায়ের সূচনা করে। সালাহ্উদ্দিনের মৃত্যু প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ইবনুল আসীর বলেন, "তাঁর মৃত্যু দিবস ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য একটি চরম বিপর্যয়। প্রথম চার খলিফার মৃত্যুর পর তারা এমন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়নি। প্রাসাদ, সাম্রাজ্য ও প্রকৃতি গভীরভাবে শোকাভিভূত হয়ে পড়ে এবং ক্রন্দনরত নগরবাসী তাঁর লাশের অনুগমন করে।"

বীরত্ব ও মহত্ব

সালাহ্উদ্দিন নিঃসন্দেহে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ও সবচেয়ে বীরোত্তম নরপতিদের অন্যতম। ইসলামের চরম দুর্দিনে পরিত্রাণকারী হিসেবে আবির্ভূত হয়ে তিনি অসাধারণ বীরত্ব ও কর্মকুশলতা দ্বারা খ্রিস্টান ক্রুসেডারদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে ইসলাম ধর্মকে শুধু বিপদমুক্তই করেননি বরং ইসলামের ইতিহাসকে গৌরবমণ্ডিত করেন। অসাধারণ বীরত্ব, অপার্থিব উদারতা ও সদাশয়তার দ্বারা তিনি ইসলামের ইতিহাসকে গৌরবমণ্ডিত ও কীর্তি সমুজ্জ্বল করে রেখেছেন। অধ্যাপক হিট্টির মতে, আরবদের মধ্যে তাঁর নাম হারুন ও বাইবাসের নামসহ আধুনিক যুগের জনপ্রিয় নেতাদের তালিকায় স্থান লাভ করছে। ঘোর শত্রু ও বিজিতদের প্রতি তিনি যেরূপ মহত্ত্ব ও দয়া প্রদর্শন করেছেন, তার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল বললেও অত্যুক্ত হবে না। খ্রিস্টানগণ সালাহ্উদ্দিনের উদার ব্যবহার ও মহানুভবতায় এতই বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তারা মুক্তকণ্ঠে তাঁর গুণগান করেছেন।

জনদরদী সুশাসক

সালাহ্উদ্দিন একজন জনদরদী শাসক ছিলেন। তাঁর শাসনের প্রধান লক্ষ্য ও জীবনের মহান ব্রত ছিল জনগণের সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করা। তিনি এই কর্তব্য কর্মে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তিনি আইয়ুবী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মাদ্রাসা, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ও রাস্তা-ঘাট নির্মাণ এবং পয়ঃপ্রণালী খনন করে প্রজার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করেছেন। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও স্থাপত্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর স্থাপত্যশিল্পের কীর্তির মধ্যে কালাত-ই-জাবাল প্রসিদ্ধ।

ধর্মানুরাগী শাসক

সালাহ্উদ্দিন একজন ধর্মানুরাগী শাসক ছিলেন। তাঁর ধর্মানুরাগ এত বেশি ছিল যে, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট অবস্থায় নামায আদায় করতেন। তিনি সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। তিনি সুন্নী ইসলামের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি মুক্ত হস্তে দান করতেন। তিনি ছিলেন দরিদ্র জনগণের অকৃত্রিম দরদী বন্ধু। সালাহ্উদ্দিনের বহুমুখী প্রতিভা জ্ঞানানুশীলনের ক্ষেত্রে নবজাগরণের সৃষ্টি করে। ইউরোপে তিনি ইংরেজ কবি ও আধুনিক উপন্যাসিকদের কল্পনাশক্তিকে স্পর্শ করেছিলেন এবং এখনও তিনি তথায় বীরধর্মিতায় উৎকর্ষের আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছেন। সালাহ্উদ্দিনের মৃত্যুর সাথে সাথেই আইয়ুবী বংশের গৌরবের অবসান ঘটে এবং সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে।

আইয়ুবী বংশের পতন

সালাহ্উদ্দিন মৃত্যুর পূর্বে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে না যাওয়ায় তাঁর মৃত্যুর পর বিশাল সাম্রাজ্য ভ্রাতা ও পুত্রগণের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তাঁর তিন পুত্রের অধীনে সাম্রাজ্য তিনটি স্বাধীন অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রথম পুত্র মালিক-উল-আফজাল সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন লাভ করেন। দ্বিতীয় পুত্র মালিক-উল-আজীজ মিশর ও তৃতীয় পুত্র মালিক-উজ-জাহির আলেপ্পো প্রাপ্ত হন।

সালাহ্উদ্দিনের পুত্রগণের মধ্যে গৃহযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মালিক-উল-আদিল (১১৯৬-১২১৮ খ্রি.) একে একে তাঁদের রাজ্যের বিভিন্ন অংশ হস্তগত করেন। মালিক-উল-আদিল একজন প্রজারঞ্জক নরপতি ছিলেন। ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে তিনি অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর তিনজন দুর্বল উত্তরাধিকারী জেরুযালেম উদ্ধারকারী ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু খ্রিস্টানদের উক্ত পবিত্র নগরী পুনরাধিকারের চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১২৫০ খ্রিস্টাব্দে এ বংশের শেষ সুলতান তুরান শাহকে নিহত করে মামলুকগণ আইয়ুবী বংশের অবসান ঘটিয়ে আইয়ুবী সাম্রাজ্য নিজেদের কারায়ত্ত করেছিলেন। মামলুক সুলতানগণ ১২৫০-১৫১৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মহাগৌরবের সাথে রাজধানী কায়রো হতে মিশরে এবং সিরিয়ার শাসনদণ্ড পরিচালনা করেছিলেন।

সার-সংক্ষেপ

সালাহউদ্দিন ছিলেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা এবং প্রজাহিতৈষী শাসক। ইতিহাসের কীর্তিমান ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি হলেন অন্যতম। বীরত্ব, মহানুভবতা ও উদারতার জন্য গাজী সালাহউদ্দিন পৃথিবীতে এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তাঁর উদারতা ও মহানুভবতার জন্য তাঁর অতিবড় শত্রুও সালাহউদ্দিনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

অসীম সাহস ও বীরত্বের সাথে তিনি মুসলমানদের স্বপক্ষে দণ্ডায়মান হন। চরম দুর্দিনে তিনি মুসলমানদের রক্ষা করেন এবং পরাজয়ের গ্লানি থেকে মুক্ত করেন। ১১৯৩ খ্রিস্টাব্দের ৪ মার্চ এই মহান নরপতি গাজী সালাহউদ্দিন মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর মৃত্যুতে সমগ্র সাম্রাজ্য এমনকি সম্পূর্ণ পৃথিবী শোকে অভিভূত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৯.১৩

সঠিক উত্তরটি বেছে নিন-

১. গাজী সালাহউদ্দিন জন্মগ্রহণ করেছিলেন-
   ক. টাইগ্রিস নদীর তীরে টাকরিট নামক স্থানে
   খ. ফোরাত নদীর তীরে কারবালা প্রান্তরে
   গ. নীল নদের তীরে কায়রো শহরে
   ঘ. ভূ-মধ্য সাগরের তীরে সিরিয়ায়।

২. সালাহ উদ্দিনের পিতা নাম-
   ক. শিরফুন খ. ইমামুদ্দিন জঙ্গী
   গ. নূরুদ্দিন জঙ্গী ঘ. নাজমুদ্দিন

৩. সালাহউদ্দিন মিসরে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে ফাতেমীদের পরিবর্তে খোৎবায় নাম পাঠকরণ-
   ক. উমাইয়দের খ. আব্বাসীয়দের
   গ. আইয়ুবীয়দের ঘ. বার্মাকীয়দে

৪. ক্রুসেডারগণকে পরাজিত করে জেরুযালেম পুনরুদ্ধার করা হয়-
   ক. উহুদের যুদ্ধে খ. কায়রোর যুদ্ধে
   গ. হিস্টিনের যুদ্ধে ঘ. ক্রুসেডের যুদ্ধে।

৫. খ্রিস্টানগণ মুসলিম সুলতানের সহানুভাতা ও উদারতায় মুদ্ধ হয়ে আজও গুণাগুন করছেন তিনি হচ্ছেন-
   ক. খলিফা আল-মামুন খ. হারুন-অর-রশিদ
   গ. সুলতান নূরদ্দিন জঙ্গী ঘ. গাজী সালাউদ্দিন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. গাজী সালাহউদ্দিন কে ছিলেন? তাঁর পরিচয় ও ক্ষমতা লাভের ইতিহাস সংক্ষেপে লিখুন।
২. তৃতীয় ক্রুসেড ও জেরুযালেম উদ্ধারে গাজী সালাহউদ্দিনের কৃতিত্ব বর্ণনা করুন।
৩. গাজী সালাহউদ্দিনের কৃতিত্ব ও চরিত্র বর্ণনা করুন।
৪. আইয়ুবী বংশের পতনের ইতিহাস লিখুন।

পাঠ ১৪ আব্বাসীয়দের শাসন ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আব্বাসীয়দের শাসন নীতি বিশ্লেষণ পারবেন
- আব্বাসীয়দের শাসন পদ্ধতি কি ছিল, বিস্তারিত বর্ণনা করতে পারবেন
- আব্বাসীয়দের প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে বলতে পারবেন।

উমাইয়া খিলাফতের পতনে আরব প্রাধান্যের পতন ঘটে আব্বাসীয় যুগে ইরানী প্রভাবের ফলে ইসলাম সার্বজনীন রূপ লাভ করে। উমাইয়াদের পতনে আরব শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং এর স্থলে আব্বাসীয়দের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকৃত ইসলামি শাসন ব্যবস্থা কায়েম হয়। প্রকৃত অর্থে আব্বাসীয় খিলাফতে জ্ঞান-বিজ্ঞান বিস্তার এবং নতুন সভ্যতা সূচনা করা হয়।

আব্বাসীয়দের শাসন নীতি

উমাইয়াদের যুগ ছিল রাজ্য জয়ের আর আব্বাসীয় যুগ ছিল রাজ্য শাসনের। উমাইয়াগণ অভিজাত আরবদেরকে অগ্রাধিকার দিতেন। কিন্তু আব্বাসীয়গণ এই সংকীর্ণ আরব জাতীয়তাবাদী নীতি পরিহার করে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষ সকল যোগ্য লোককে খিলাফতের যে কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল করতেন। আব্বাসীয় শাসন জাতীয় সাম্যনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

আব্বাসীয় শাসন ব্যবস্থা মূলত দুই ভাগে বিভক্ত ছিল–

ক. কেন্দ্রীয় ও

খ. প্রাদেশিক

ক. কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা

১. খলিফা ঃ আব্বাসীয় খিলাফতের শাসন কাঠামোর শীর্ষদেশে অবস্থান করতেন খলিফাগণ। খলিফা ছিলেন সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যাপারে সকল গুরুত্বপুর্ণ আদেশ নির্দেশ তিনিই জারি করতেন। তাঁর কার্যাবলী প্রধানত ধর্মীয় ও রাজনৈতিক এ দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। তার রাজনৈতিক ক্ষমতা সামরিক ও বেসামরিক এ দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। উমাইয়াদের ন্যায় আব্বাসীয় খলিফাগণও খিলাফতে উত্তরাধিকারী মনোনীত করতেন। এ ব্যাপারে তাদের কোন নীতি নির্দিষ্ট ছিল না।

২. মন্ত্রণা পরিষদ ঃ খলিফা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হলেও তাঁকে পরামর্শ দানের জন্য ছিল একটি মন্ত্রণা পরিষদ। এই বংশের পাঁচ জন খলিফার আমলে 'বিভাগীয় মন্ত্রী' পরিবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং বাগদাদের অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকদের দ্বারা গঠিত একটি মন্ত্রণা পরিষদ খলিফাকে পরামর্শ দিতেন।

৩. হাজীব ঃ খলিফার নিত্যসহচর ছিলেন হাজীব অথবা রাজপরিবারের গৃহাধ্যক্ষ। হাজীবের কর্তব্য ছিল বিদেশী দূতবর্গকে আমন্ত্রণ ও পরিচয় করিয়ে দেয়া। হাজীব ছিল সশস্ত্র কর্মচারী। তার অনুমতি ছাড়া কেউ খলিফার সাথে সাক্ষাত করতে পারত না।

৪. উজীর ঃ খলিফার পরেই প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন উজীর। পারস্য রীতির অনুকরণে আব্বাসীয় খলিফাগণ সর্বপ্রথম উজীর বা প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। তিনি রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনার ব্যাপারে খলিফাকে সাহায্য করতেন। উজীর ছিলেন দুই শ্রেণীর। যথা- অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন উজীর এবং সসীম ক্ষমতাসম্পন্ন উজীর। অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন উজীর কর্মচারী নিয়োগ অথবা বাতিল করতে পারতেন।

৫. জল্লাদ এবং জ্যোতিষী নিয়োগ ঃ রাজদরবারে জল্লাদ ও জ্যোতিষী পদাধিকারী দুজন কর্মকর্তার প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। আরবের ইতিহাসে সর্বপ্রথম রাজপ্রাসাদের গুপ্ত কক্ষে বিদ্রোহী ও সমাজদ্রোহীদের শাস্তি দেয়ার প্রথা প্রচলিত হয়। পারস্য রীতির অনুকরণে জল্লাদ ও জ্যোতিষী নিযুক্ত করা হয়।

৬. দিওয়ানুল আযীয ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কার্য তদারক করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে দিওয়ানুল আযীয নামে একটি মন্ত্রী পরিষদ ছিল। দিওয়ানুল আযীযের অধীনে যে সকল শাসন বিভাগ ছিল তা হল ঃ

ক. দিওয়ানুল খারাজ ঃ উমাইয়া শাসন ব্যবস্থার মত আব্বাসীয় যুগে দিওয়ানুল খারাজ বা রাজস্ব বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিভাগকে অর্থ বিভাগের সাথে একত্রিত করা হয়। রাজস্ব আদায় ও হিসাব রাখা এই বিভাগের প্রধান কাজ। রাজস্বের প্রধান উৎস ছিল যাকাত, জিযিয়া, খারাজ, উশর, আমদানি কর, বিজিত অঞ্চলের প্রদত্ত অর্থ, গো-চারণ কর প্রভৃতি।

খ. দিওয়ানুর রাসায়েল ঃ এই বিভাগ রাজকীয় আদেশ, উপাধি পত্র প্রদান, রাজ প্রদত্ত ক্ষমতা পত্র, রাজনৈতিক যোগাযোগ ইত্যাদি কার্যাদি সম্পাদন করত।

গ. দিওয়ানুল খাতাম ঃ খলিফা কর্তৃক লিখিত প্রতিটি ফরমান এ বিভাগে সংরক্ষিত হত। তারপর সিল মোহর যুক্ত হয়ে আসল ফরমানটি যথাস্থানে পাঠানো হত, ফলে রাজকীয় কোন আদেশনামা জাল হতে পারত না।

ঘ. দিওয়ানুল বারীদ ঃ চিঠি-পত্র আদান প্রদান ছাড়াও এটা গোয়েন্দা বিভাগের কাজ করত। ডাক বহনের জন্য আরব ও সিরিয়ায় উটের এবং পারস্যে অশ্ব এবং খচ্চরের রিলে ব্যবস্থা ছিল। সাহিবুল বারীদ (ডাক কর্মকর্তা) এই বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন।

ঙ. দিওয়ানুশ শুরতা (পুলিশ বিভাগ) ঃ নাগরিকদের জানমাল রক্ষা এবং আইন কানুন বলবত রাখার দায়িত্ব এ বিভাগের উপর ন্যস্ত ছিল। সাহিবুশ শুরত ছিলেন বিভাগীয় প্রধান। মুহতাসিবের অধীনে সাধারণ নিয়োগ করা হতো। তিনি হাট বাজার দেখাশুনা, ওজন পরীক্ষা, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি পরিদর্শন করতেন। সমাজে অবৈধ কার্যকলাপ তিনি দমন করতেন।

চ. দিওয়ানুন নযর ফিল মাযালিম ঃ আব্বাসীয় খলিফাগণ অত্যাচারিতদের অভিযোগ শ্রবণের জন্য এ বিভাগের প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যায় ও পক্ষপাতমূলক রায়ের বিরুদ্ধে এই বিভগে আপত্তি গৃহীত হত।

ছ. বিচার বিভাগ ঃ কাযী-উল-কুয্যাত প্রধান বিচারপতির অধীনে একটি স্বাধীন বিচার বিভাগ ছিল। ফৌজদারী বিচারের ভার সাহিবুল মাযালিমের উপর ন্যস্ত ছিল। অভিযোগ ও তদন্ত বিভাগও ছিল অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আদালত।

জ. দিওয়ানুল জুনদ ঃ আরব ও অনারবদের দ্বারা গঠিত সৈন্যবাহিনী নিয়মিত ও অনিয়মিত এই দুভাগে বিভক্ত ছিল। নিয়মিত বাহিনী নিয়মিত বেতন ও ভাতা পেত। অনিয়মিত বাহিনী শুধুমাত্র যুদ্ধরত অবস্থায় বেতন পেত, অন্যথায় রেশন পেত। নিয়মিত বাহিনী পদাতিক, অশ্বারোহী, তীরন্দাজ, শ্রমিকবাহিনী ইত্যাদিতে বিভক্ত ছিল। যুদ্ধে তারা অগ্র, পশ্চাৎ, বাম, ডান ও মধ্য এই পাঁচভাগে বিভক্ত হত। তীর, ধনুক, বর্শা, বল্লম, ঢাল ও তরবারী ছিল যুদ্ধাস্ত্র।

ঝ. বিবিধ ঃ উল্লিখিত বিভাগগুলো ছাড়াও আরও কিছু বিভাগ শাসন কার্যের সুবিধার জন্য করা হয়েছিল। সেগুলো হল ঃ

- দিওয়ানুস সাওয়াফি (খাস-ভুমি সংরক্ষণ বিভাগ)
- দিওয়ানুদ দিয়াহ
- দিওয়ানুল আযিমাহ (কেন্দ্রীয় হিসাব পরীক্ষা বিভাগ)
- দিওয়ানুল আতা (দান-খয়রাত বিভাগ)
- দিওয়ানুস সির (গোয়েন্দা বিভাগ)এবং
- দিওয়ানুল আকরিকহ (পয়ঃপ্রণালী ও সেচ বিভাগ।

খ. প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা

১. প্রদেশ ঃ পারস্য বায়জানটাইন নীতির অনুসরণে উমাইয়া রাজত্বে সমগ্র দেশে সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য যে প্রদেশের সৃষ্টি হয়েছিল আব্বাসীয় আমলে তার কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি। ঐতিহাসিকদের বর্ণনা হতে জানা যায় যে, আব্বাসীয় খিলাফতের প্রথম যুগে সমগ্র সাম্রাজ্যে ২৪টি মতান্তরে ৩৫টি প্রদেশ ছিল। প্রত্যেক প্রদেশের শাসনভার আমীর নামক কর্মকর্তার উপর ন্যস্ত ছিল।

২. আমীর ঃ প্রদেশের প্রধান শাসনকর্তা ছিলেন আমীর। খলিফা তাঁকে নিযুক্ত করতেন। কৃতকর্মের জন্য আমীর খলিফার নিকট দায়ী থাকতেন। শাসন ব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ রক্ষার জন্য এক প্রদেশ হতে অন্য প্রদেশে আমীরদের বদলী করা হত। ধর্মীয় কার্যকলাপ পরিচালনা এবং শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা আমীরের দায়িত্ব ছিল।

৩. প্রাদেশিক বিভাগ ঃ প্রত্যেক প্রদেশে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য ৫টি বিভাগ ছিল–

ক. দিওয়ান আল খারাজ খ. ভাক বিভাগ গ. পুলিশ বিভাগ
ঘ. সামরিক বিভাগ ঙ. বিচার ও বিবিধ শাসন বিভাগ।

সার-সংক্ষেপ
আব্বাসীয় বংশের খিলাফত কালের শাসন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশ্লেষণ করলে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তৎকালীন আব্বাসীয় শাসন ব্যবস্থা ছিল পরিকল্পিত, সুশৃঙ্খল যা আধুনিক বিশ্বে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ও প্রশাসনিক সচেতনতার ভিত্তি হিসেবে পরিচিত। ঐতিহাসিক আমীর আলী আব্বাসীয়দের মূল্যায়ন করেছেন এভাবে– তাদের শাসনামলে আরবদের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ আশ্চর্যজনক দ্রুততার সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছিল।"

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৯.১৪

অল্প কথায় উত্তর দিন-

১. আব্বাসীয় শাসন কোন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল?
২. খলিফার ক্ষমতা কেনম ছিল?
৩. 'হাজাব' কি?
৪. ওজার ও উজারের ক্ষমতা কেমন ছিল?
৫. 'জল্লাদ' এর কাজ কি ছিল?
৬. 'দিওয়ানুল খারাজ' কি?
৭. 'দিওয়ানুল বারীদ' এর উদ্দেশ্য কি?
৮. 'দিয়ানুশ-শুরতা' কি?
৯. 'দিওয়ানুল জুনদ' অর্থ কি? এটা কিভাবে গঠিত হত।
১০. 'আমীর কার উপাধি ছিল? তাঁর কাজ কি ছিল?

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. আব্বাসীয়দের কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার বর্ণনা দিন।
২. আব্বাসীয়দের প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা উল্লেখ করুন।

পাঠ ১৫ আব্বাসীয় বংশের পতন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আব্বাসীয় বংশের পতন বিষয়ে বলতে পারবেন
- আব্বাসীয় বংশের পতনের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ কারণগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

সুস্বাস্থ্যের অধিকারী কোন লোক রোগাক্রান্ত হলে আস্তে আস্তে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। খরস্রোতা নদীতে পানির অভাব দেখা দিলে আস্তে আস্তে ক্ষীণকায়া ও পরে বিলীন হয়ে যায়। তদ্রূপ বড় বড় সাম্রাজ্য ও শাসকদের দুর্বলতা ও অযোগ্যতার কারণে পর্যায়ক্রমে ধ্বংস হতে থাকে। আবুল আব্বাস আস-আন্দোলনের মাধ্যমে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়া সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের ওপর প্রতিষ্ঠিত বিশাল আব্বাসীয় খিলাফত শাসকদের দুর্বলতা, সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি, উত্তরাধিকার নীতির অভাবে পর্যাক্রমে দুর্বল হয়ে যায়। পরবর্তী সময় মোঙ্গল নেতা হালাকু খানের ১২৫৮ সালে বাগদাদ আক্রমণ ও ব্যাপক ধ্বংস করেন যার পরিণতিতে এই ঐতিহ্যবাহী বংশ কালের অতল গহ্বরে তলিয়ে যায়। দৃশ্যত আব্বাসীয় খিলাফত পাঁচ শতাধিক (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) বছর স্থায়ী হলেও এর অবক্ষয়ের ঘন্টা বেজে উঠে খলিফা ওয়াসিফের আমলের (৮৪২-৮৪৭) পর থেকেই। আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের ক্রমাবনতি ও পতনের কারণগুলো দুভাগে ভাগ করে আলোচিত হল। (এক) পরোক্ষ কারণ (দুই) প্রত্যক্ষ করণ।

এক. পরোক্ষ কারণ

প্রাকৃতিক নিয়ম বা ঐতিহাসিক কারণ ঃ উত্থানের পর বিকাশ, বিকাশের পর বিনাশ এটা নিয়তির খেলা এবং প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম। তৎকালীন খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন যথার্থই বলেছেন, "সাধারণ কোন রাজবংশ এক শতাব্দির অধিক কাল কর্মশক্তি এবং শৌর্য-বীর্য বজায় রাখতে পারে না। তার পরেই শুরু হয় পতনের পালা।" যদিও ৭৫০-১২৫৮ খ্রি. পর্যন্ত আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত যোগ্যতা এবং দক্ষতার সাথে সাম্রাজ্য পরিচালিত হয়েছিল ৭৫০-৮৪৭ খ্রি. পর্যন্ত। আল-মুতাওয়াক্কিলের খিলাফত থেকেই পতনের পালা শুরু হয়। ঐতিহাসিক 'P. K. Hitti যথার্থ বলেন, "আল-মুতাওয়াক্কিল পতন যুগের প্রথম খলিফা।"

উত্তরাধিকারীদের ব্যর্থতা ও অকর্মণ্যতা ঃ আব্বাসীয় বংশের পতনের অন্যতম কারণ হলো দুর্বল উত্তরাধিকারীদের শাসন। আল-মনসুর, হারুন-অর-রশীদ, আল-মামুন, অত্যন্ত যোগ্য শাসক ছিলেন। তাদের শাসনব্যবস্থায় আব্বাসীয় খিলাফতের যথেষ্ট সম্মান ও গৌরব বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ভালভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এই বংশের ৩৭ জন খলিফার মধ্যে সামান্য কয়েকজন ছাড়া অন্যান্য অধিকাংশ শাসক ছিলেন বিলাসী, অযোগ্য এবং অকর্মণ্য। দুর্বল শাসকদের সময় রাজ্যের ভেতরে বিভিন্ন বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, এমন কি সেনাবাহিনীর ভেতরেও অরাজকতা দেখা দেয়। যার জন্য এ বংশের পতন আর ঠেকানো সম্ভব হয়নি। পিকে হিট্টি ঐতিহাসিক তাহলিবির মন্তব্য উল্লেখ করে বলেন- "আব্বাসীয় খিলাফতের গৌরবের সূচনা করেন। আল-মনসুর একে পরিপূর্ণ করেন আর আল-মুতাজিদ এর বিনাশ ঘটান।"

উত্তরাধীকার নির্বাচনে ব্যর্থতা ঃ এই রাজবংশের পতনের একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হলো উত্তরাধীকার নির্বাচনের কোন মৌলিক নীতিমালা না থাকা। সেজন্য যখনই কোন খলিফা মারা যেতেন তখন দেখা যেত খলিফা নির্বাচনের মনোনয়ন নিয়ে দলাদলি, বিশৃঙ্খলা, আক্সলহ, গভীর ষড়যন্ত্র ও গুপ্ত হত্যা। আর এটাই এ বংশের পতনকে অনেকটা ত্বরান্বিত করে।

সাম্রাজ্যের ব্যাপকতা বা বিশালতা ঃ ঐতিহাসিক বার্নাড লুইস "আব্বাসীয় সাম্রাজ্যকে বিশাল ইসলামি সাম্রাজ্য বলে অভিহিত করেন।" এই সাম্রাজ্যের ব্যাপকতা পতনকে তরান্বিত করে। কারণ বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য যথাযথ কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। এই সাম্রাজ্য আটলান্টিক মহাসাগর হতে নীল নদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই বিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না। অতি জরুরী সময় সংবাদ প্রেরণ এবং কোন বিদ্রোহ দেখা দিলে সৈন্যবাহিনী ও রসদ প্রেরণ ছিল সময় সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল ব্যাপার। তা ছাড়া শাসকদের ব্যর্থতার কারণে বিভিন্ন রাজবংশের উৎপত্তি হয়। বিশেষ করে বুয়াইয়া বংশ, ফাতেমী বংশ ও ইদ্রিসী বংশ প্রমুখ। এই রাজবংশগুলো, রাষ্ট্রের ভিতরে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে যা পরিণামে পতনের দিকে সাম্রাজ্যকে ঠেলে দেয়।

সামরিক বিভাগের প্রতি উদাসীনতা ও অবজ্ঞা ঃ যে কোন সাম্রাজ্যের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার অতন্ত্র প্রহরী হিসেবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করে সামরিক বাহিনী। আব্বাসীয় যুগ ছিল জ্ঞান, বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্যের উন্নয়নের যুগ। এই যুগের শাসকগণ দক্ষ ও যোগ্য সৈন্যবাহিনী গঠনের জন্য কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। যোগ্য সামরিক বিভাগ গঠন না করায় আব্বাসীয় সামরিক বাহিনী তাদের দক্ষতা ও যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। তাছাড়া উন্নত প্রশিক্ষণের অভাব যেমন ছিল তেমনি আবার শত্রুপক্ষের প্রতিরোধ করার মত কোন মারণাস্ত্র ছিল না। আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের সামরিক বাহিনীর অবস্থা এতই শোচনীয় ছিল যে, তারা অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনে যেমন ব্যর্থ হয়, বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতেও তেমন সক্ষম ছিল না। ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে হালাকু খানের বাহিনীকে পরাজিত করার মত দক্ষ সামরিক বাহিনী আব্বাসীয়দের ছিল না।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঃ আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কেন্দ্রে অধিকাংশ সময়ই শক্তিশালী শাসক ছিল না। এই কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার দুর্বলতা, সাম্রাজ্যের ব্যাপকতা, উন্নত যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভাব, প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বিলাসিতা এবং দুর্বল উত্তরাধিকারী ও শাসক থাকার কারণে এই সাম্রাজ্যের ভিতরে বিভিন্ন বিদ্রোহ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। যোগ্য সেনাবাহিনীর অভাব আর শাসকদের দুর্বলতার কারণে বিভিন্ন রাষ্ট্র স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং এই রাষ্ট্রসমূহ স্বাধীনভাবে শাসনকার্য চালাতে থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের জন্মলাভ আব্বাসীয় বংশের পতনকে ত্বরান্বিত করে।

খলিফাদের নৈতিকতার অভাব ঃ চরিত্র হলো মানব জীবনের অমূল্য সম্পদ। কোন মানুষের চরিত্র যখন নষ্ট হয়, তখন ঐ চরিত্রহীন মানুষ ও পশুর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। যে কোন জাতির ধ্বংস সাধন করতে হলে প্রথমেই ধ্বংস করতে হয় ঐ জাতির লোকের চরিত্র। তেমনি ইতিহাসের পাতা থেকে আব্বাসীয়দের বিদায় নেয়ার অন্যতম কারণ আব্বাসীয় যুগের শেষ ভাগের শাসকদের নৈতিক অধঃপতন। শাসকদের নৈতকতার অভাবে তারা রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য কোন চিন্তা ভাবনার সুযোগ পাননি।

প্রাদেশিক সরকারের স্বার্থপরতা ঃ আব্বাসীয় যুগে অনেকগুলো প্রদেশ ছিল। প্রাদেশিক শাসকরা ছিলেন অত্যন্ত স্বার্থপর। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসকদের মধ্যে সুসম্পর্কের অভাব ছিল। প্রাদেশিক সরকারের হাতে রাজস্ব ও সামরিক বিভাগের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল। প্রাদেশিক উচ্চাভিলাষী শাসকগণ সুযোগ বুঝে কেন্দ্রীয় সরকারকে অসহযোগিতা করত।

সামন্ত প্রথার প্রবর্তন ঃ আব্বাসীয় যুগে কোন কোন শাসক সামন্ত প্রথা প্রবর্তনে সহায়তা করেন। সামন্ত প্রথা প্রবর্তিত হওয়ায় সামন্ত প্রভুগণ প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী হয়। তারা রাষ্ট্রের মধ্যে সুযোগ বুঝে বিভিন্ন বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলার সষ্টি করে। তারা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ফলে এ বংশের পতনের ধারা ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হতে থাকে।

দলগত বিরোধ ঃ আব্বাসীয় শাসনামলে দলগত বিরোধ চরম আকার ধারণ করে। আরব মুসলিম ও অনারব মুসলিম এবং মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে দলগত বিরোধ মারাত্মক আকার ধারণ করে।

বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ঃ আব্বাসীয় যুগে শিআ-সুন্নী, মু'তাযিলা, আশারিআ, কারামতী, যিন্দিক, ইসমাইলীয়া ইত্যাদি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। শিআ-সুন্নী বিরোধ দেখা দেয়। আল-মনসুরের শাসনামলে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালিককে পর্যন্ত নির্যাতন করা হয়। খলিফাদের এই সংকীর্ণ ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনা জনসাধারণের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি করে। মামুন মু'তাযিলা মতবাদেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি মু'তাযিলা মতবাদকে ৮৩৩ খ্রি. সরকারিভাবে মর্যাদা দান করেন। এর সমালোচনা করার কারণে খলিফা আহমদ ইবনে হাম্বলকে কারারুদ্ধ করেন। বিশেষ করে কারামতি গুপ্ত ঘাতক ও যিন্দিক সম্প্রদায়ের লোকেরা অনৈসলামিক কাজে লিপ্ত ছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিরোধ আব্বাসীয় শাসকদের পক্ষে দূর করা সম্ভব হয়নি, ফলে এ বংশের পতন ত্বরান্বিত হয়।

তুর্কী বাহিনীর প্রধান্য ঃ আব্বাসীয় বংশের পতনের ক্ষেত্রে খলিফা মুতাসিম কর্তৃক তুর্কী সেনাবাহিনী গঠন করাটাও অনেকাংশে দায়ী। এ তুর্কী বাহিনী ছিল অতি শক্তিশালী। তিনি এই বাহিনীর হাতে অত্যধিক ক্ষমতা প্রদান করেন। তুর্কী সেনাবাহিনীর আশীর্বাদ নিয়ে শাসকদের শাসনকার্য পরিচালিত করতে হত। এই বাহিনী গঠন করা মুতাসিমের চরম ভুল হয়েছিল। কারণ তুর্কী বাহিনী খলিফাকে অপসারণ ও নির্বাচিত করার ক্ষমতা রাখত। উচ্চাভিলাষী ও ক্ষতালোভী তুর্কী বাহিনীর হস্তক্ষেপ আব্বাসীয় শক্তি ও শাসনকে অত্যন্ত দুর্বল করে দেয়।

ফাতেমীয়দের মূল্যায়নের অভাব ঃ উমাইয়া বংশের পতনের আন্দোলনে ফাতেমীয়রা সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করে উমাইয়া সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত করে। অথচ আব্বাসীয়রা ক্ষমতায় আসার পর তাদেরকে কোন মূল্যায়ন করা হয়নি। এমনকি কোন কোন জায়গায় তাদেরকে বিভিন্নভাবে দমন করা হয়। যার জন্য আব্বাসীয়দের পতনের প্রাক্কালে তারা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

অর্থনৈতিক সংকট ঃ অর্থনৈতিক সংকটও আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের পতনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের অধিকাংশ খলিফা, আমীর-ওমরা ও অভিজাত শ্রেণী ভোগ-বিলাস আর মদ-নারী নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে রাষ্ট্রের রাজকোষ শূন্যের কোঠায় পৌঁছে। এছাড়া কৃষকদের উপর অত্যধিক কর ধার্য করার ফলে তারা কৃষিকাজ ছাড়তে বাধ্য হয়। কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন একদম বন্ধ হয়ে যায়। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা করুণ আকার ধারণ করে। সাম্রাজ্যের মধ্যে দুর্ভিক্ষ আর অনাহারে অনেক লোক মারা যায়। জনসাধারণের জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। বন্যা আর দুর্ভিক্ষের কারণে জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে হ্রাস পায়। আর্থিক সংকটের কারণে সৈন্যবাহিনীর বেতন বকেয়া হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে শাসকদের বিরুদ্ধে সৈন্যরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। অর্থনৈতিক সংকট দূর করে সাম্রাজ্যকে স্থিতিশীল করার মত মনোবল ও ইচ্ছা পরবর্তী শাসকদের ছিল না।

দুই. প্রত্যক্ষ কারণ

বাইজানটাইনদের আক্রমণ ঃ আব্বাসীয় খিলাফতের প্রতিষ্ঠালাভ বাইজানটাইনরা পছন্দ করেনি; তারা সর্বদাই আব্বাসীয় খিলাফত ধ্বংসের চেষ্টা করত। খলিফা হারুন-অর-রশীদ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যকে বাইজানটাইনদের হাত থেকে রক্ষার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করেন। খলিফা হারুনের উদারতা আর উঁচুমনের কারণে তাদের সাথে কয়েকবার সন্ধি হয়। কিন্তু বাইজানটাইনরা সুযোগ খুঁজতে থাকে। তারা কয়েকবার এই সাম্রাজ্যকে আক্রমণ করে। তাদের হিংসাত্মক ও ধ্বংসমূলক কাজে আব্বাসীয় সাম্রাজ্য ক্রমশ দুর্বল হতে থাকে।

হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ আক্রমণ ঃ ঐতিহ্যবাহী আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও পতনের সর্বশেষ এবং প্রত্যক্ষ কারণ হচ্ছে দুধর্ষ মোঙ্গল নেতা হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ আক্রমণ। হালাকু খান ১২৫৩ খ্রিস্টাব্দে গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়কে চিরতরে ধ্বংস করার জন্য আব্বাসীয় বংশের সর্বশেষ খলিফা মুনতাসিমের নিকট সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ভাগ্যের নির্মম পরিহাস খলিফা তার আহবানের যথার্থ উত্তর প্রেরণ করেননি। খলিফার এই আচরণকে হালাকু খান অপমানজনক মনে করেন। তিনি নিজেই ১২৫৩ খ্রি. বিশাল বাহিনী নিয়ে গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়কে দমন করতে সক্ষম হন। ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে হালাকুখান বাগদাদ আক্রমণ করে ৪০ দিন অবরোধ করে রাখেন। প্রতিরোধ করার ক্ষমতা না থাকায় প্রাণ ভিক্ষা চান আব্বাসীয় শেষ খলিফা মুসতাসিম। ১২৫৮ খ্রি. ফেব্রুয়ারি মাসে খলিফা ও তাঁর পরিবারের সবাইকে অতি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। নিষ্ঠুর হালাকু খানের বাগদাদ আক্রমণের সময়ে সেখানকার অধিবাসী ২০ লক্ষের মধ্যে ১৬ লক্ষই মারা যায়।

তার আক্রমণের হাত থেকে শিশু, নারী ও বৃদ্ধাগণ পর্যন্ত রেহাই পায়নি। হালাকু খানের আক্রমণের হাত হতে মসজিদ, মাদ্রাসা, গ্রন্থাগার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল সমাধিসৌধ কিছুই রক্ষা পায়নি। তার আক্রমণে তিনদিন পর্যন্ত বাগদাদ নগরীতে রক্তের বন্যা বয়ে যায়। বাগদাদ নগরীকে জনমানবহীন বধ্যভূমির মত পড়ে থাকতে দেখা যায়।

সার-সংক্ষেপ

জাতীয় চরিত্রে যখন অনাচার, অবিচার, দুর্নীতি আর ভোগবিলাস প্রবেশ করে, সে জাতি তখন তার ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলে। আব্বাসীয় বংশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় অধিকাংশ খলিফা ভোগবিলাস, মদ, নারী আর নিজেদের স্বার্থ নিয়ে এতই ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে, তাদের সাধারণ মানুষের কল্যাণ করার মত মানসিকতা লোপ পায়। পরিণামে শুরু হয় বিভিন্ন গোত্রীয় সংঘাত, সামরিক বিভাগে অনৈক্য, নতুন নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব, খিলাফতের প্রতি জনগণের অবিশ্বাস। অবশেষে যখন আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সামরিক, ধর্মীয়, নৈতিক ও আভ্যন্তরীণ অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হয় তখন সবশেষে হালাকু খানের আক্রমণের মধ্য দিয়ে এই সাম্রাজ্য ১২৫৮ খ্রি. ইতিহাসের পাতা থেকে বিদায় নেয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৯.১৫

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. আব্বাসীয় বংশের পতনের পরোক্ষ ৫টি কারণ বর্ণনা করুন।
২. আব্বাসীয় খিলাফতের প্রত্যক্ষ কারণ উল্লেখ করুন।

রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. আব্বাসীয় আন্দোলনের বর্ণনা দিন।
২. আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠায় আবুল আব্বাস আস-সাফফাহর ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন।
৩. আল-মনসুরের খিলাফত এবং আব্বাসীয় শাসন দৃঢ়ীকরণ তাঁর ভূমিকা নিরূপণ করুন।
৪. খলিফা আল-মনসুরের চরিত্র ও কৃতিত্ব বর্ণনা করুন।
৫. খলিফা হারুন-অর-রশিদ এর খিলাফত লাভ এবং তাঁর অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি বিশ্লেষণ করুন।
৬. হারুন-অর-রশিদ এর কৃতিত্ব ও চরিত্র মূল্যায়ন করুন।
৭. আল-আমীন ও মামুনের মধ্যে গৃহযুদ্ধের বর্ণনা দিন।
৮. বার্মাকীদের উত্থান ও পতনের কাহিনী বর্ণনা করুন।
৯. আল-মামুন এর শাসনামলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্পর্কে বিবরণ দিন।
১০. বুয়াইদের উত্থান ও পতনের বিবরণ দিন।
১১. সেলজুক বংশের উত্থান ও পতনের কারণ বিশ্লেষণ করুন।
১২. ক্রুসেডের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা করুন।
১৩. গাজী সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীর ক্ষমতা লাভ এবং তৃতীয় ক্রুসেড ও জেরুযালেম পুনরুদ্ধার সম্পর্কে বর্ণনা দিন।
১৪. আব্বাসীয়দের শাসন পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।
১৫. আব্বাসীয় বংশের পতনের কারণ বর্ণনা করুন।